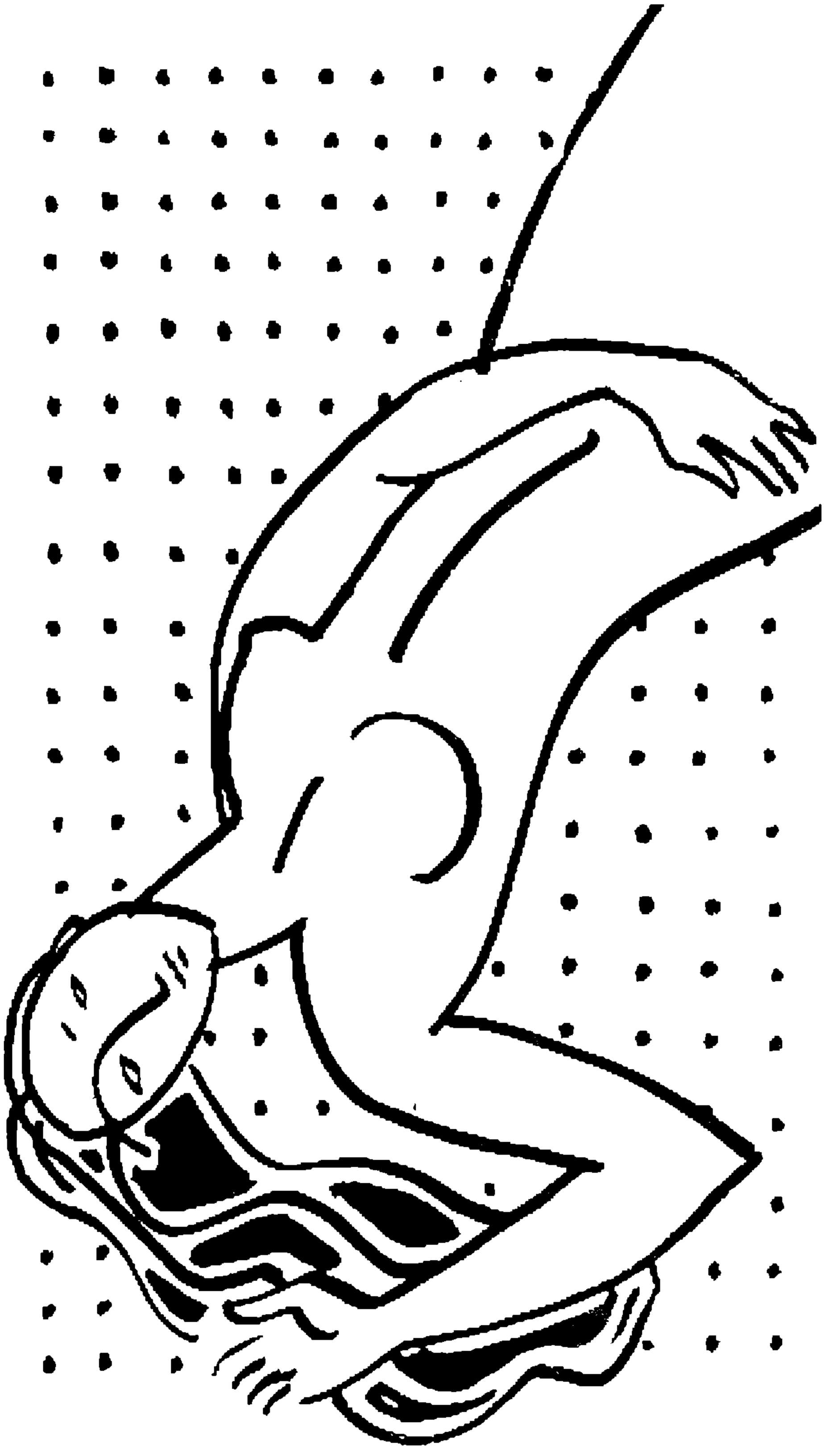

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

এসো, নীপবনে

(একটি গোয়েন্দা কাহিনী)

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

১/রাত যখন ১০টা

নর্থ এবং সাউথ ব্লক মিলিয়ে মোট ৪০টি ফ্ল্যাট। এক-একটি ব্লকে ২০টি করে। চারতলা পর্যন্ত কমবেশি ১২০০ স্কোয়ার ফুট ফ্ল্যাটের মুখোমুখি ব্লক দুটি, দুটি ফার্স্ট ব্র্যাকেটের মতো, বিশাল ও বৃত্তাকার কম্পাউন্ডটিকে ধরে রেখেছে। একেবারে মধ্যিখানে শিশুদের জন্য মানানসই ছোট্ট পার্ক— কেন্দ্রস্থলে ক'টি পামগাছ। পার্ক ঘিরে ড্রাইভওয়ে। কম্পাউন্ডের মধ্যে লম্বা-লম্বা পোস্ট থেকে আলোর ফুটবলগুলি জ্বলে উঠেছে খানিক আগেই। শীতকালের সন্ধ্যাবেলা। নর্থ ব্লকের গাড়িবারান্দার নিচে একটি লঝ্ঝড় সাদা ফিয়াট এসে দাঁড়াল। গাড়ি থেকে নামলেন আই বি-র প্রাক্তন অ্যাসিস্ট্যান্ট কমিশনার উমেশ সামন্ত। উনি এসেছেন একতলায় ২নং ফ্ল্যাটের মিসেস কনকলতার ফ্ল্যাটে।

বেল দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে বিউটি ঘেউ ঘেউ করে উঠল। তারপর বেশ কিছুক্ষণের স্তব্ধতা। এই বেলটা ছিল ডাঃ গাউরের শখের জিনিস, হংকঙে কেনা। হরেক রকম শব্দ হয় এ থেকে, আর কখন যে কোনটা হবে তা সত্যিই বলা কঠিন। তার মধ্যে এই ভূতের হাসির শব্দটা হয়েছে কি, বিউটি আপত্তি জানাবেই। তবে মাত্র একবার। থর মরুভূমির ঢোল কুকুর এখন বিরল। কলকাতায় এই একটা বলেই ধারণা উমেশবাবুর। এরা কথা বলে। পোষ মানে না। গৃহস্থের বাড়ি থেকে একবার বেরিয়ে গেলে— এরা ফেরে না।

উমেশবাবু দ্বিতীয়বার বোতাম টিপলেন না। পিপ-হোল দিয়ে আগন্তুক কে, নিঃসংশয়ে দেখে নিচ্ছেন। সময় তো একটু লাগবেই। একা থাকেন। তা ছাড়া, একেবারে শুরুতেই ধরা-পড়া এবং সঙ্গে সঙ্গে অপারেশন হওয়া সত্ত্বেও গ্লকোমা তাঁর দু'চোখের দৃষ্টিই অনেকখানি কেড়ে নিয়েছে। বস্তুত, এখন তাঁকে একটি শক্তিশালী আতশকাচ রাখতে হয়েছে পিপ-হোলের ওপর।

দরজা থেকে একটু পিছিয়ে দাঁড়ান উমেশবাবু। যা বিতিকিচ্ছিরি লম্বা, ওঁর খালি মনে হয়, আপাদমাথা ফর্মাখানা হয়ত সবটা ধরা পড়ছে না। বিশেষত মুখটা তাঁর, হয়ত বা পিপ-দৃষ্টির সীমার বাইরেই থেকে যাচ্ছে। না; গেছে দেখা। ডোর-চেন খোলার শব্দ শোনা যাচ্ছে।

দরজা খুলে শ্রীমতী গাউর বললেন, 'আসুন ইনস্পেক্টর।' যদিও তখনও তালাবন্ধ কোলাপসবল গেটের বাধা।

উমেশবাবু রিটায়ার করেছেন দু' বছর আগে। দীর্ঘদেহী উমেশবাবুর গড়ন উত্তরপ্রদেশী ঠাকুর-ঘরানার, শুধু লম্বা নন, অনুপাতে তিনি চওড়াও। এক কথায় দৈত্যাকার। দেখলেই মনে হয়, এই মাল-মেটিরিয়াল দিয়ে অন্তত দু'জন মানুষ অনায়াসেই তৈরি হতে পারত—.দু'জন বাঙালির পক্ষে তো যথেষ্টই। ধবধবে সাদা টি-শার্টের হাতা তাঁর কাফ-মাসলের ওপর এত আঁটসাট হয়ে বসে যে, বাইসেপ ফোলালে হয়ত সেলাই-ছেঁড়ার পুটপুট শোনা যাবে। অথচ, মাথাময় ঘাড়-পর্যন্ত-লটকানো কবিসুলভ চুলগুলি কত নিষ্কলঙ্কভাবে সাদা, এমনকি প্রকাণ্ড ভ্রূ জোড়াও, চোখের নিচে মোটা নীলাভ পাউচ; গালের মাংস নিচের দিকে ঝুলে এসে গলকম্বলের পূর্বাভাস দিতে শুরু করেছে। ঠোঁট বলতে শুধু নিচেরটি, অত্যধিক চুরোট-সেবনের কারণে যা রীতিমত ঝুলে থাকে। ওষ্ঠাংশ, নিয়মিত কসমেটিক-যোগে পাকানো পুরুষ্টু গোঁফ-জোড়ার নিচে সব-সময় ঢাকা। বলা বাহুল্য তাঁর গোঁফজোড়াও কালিমাবিহীনভাবে সাদা। সব মিলিয়ে হঠাৎ দেখলে মনে হয়, কোনও

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

অতিকায় যুবক যেন বৃদ্ধের অসমাপ্ত ছদ্মবেশে অবতীর্ণ হয়েছে। গণ্ডপ্রদেশের লালচে রঙ তো বিশেষভাবে সেদিকেই ইঙ্গিত করে। যেন এইমাত্র গ্রিনরুম থেকে বেরলেন আর কি!

ড্রয়িংরুমের সেন্টার টেবিলের ওপর মোটা মলাক্কা বেতের ছড়িটা লম্বালম্বি শুইয়ে দিয়ে, ল্যাম্পস্ট্যান্ডের ধারে হাই-নেক চেয়ারটায় বসলেন উমেশ সামন্ত। সঙ্গে সঙ্গে 'ক্যাঁঅ্যাঁচ'-শব্দে অস্ফুট আর্তনাদ এক। উনি এলে বরাবর ওখানেই বসেন। সিধে হয়ে বসতে পছন্দ করেন বলেই ওই লম্বা আসনখানি উমেশবাবুর পছন্দ এবং শুধু তিনি বসামাত্র ওঠে ওই ক্যাঁচ-ধ্বনি।

অন্যান্য দিনের মতো শ্রীমতী গাউর বসলেন এ-প্রান্তের সিঙ্গল সোফাটিতে। এদিকটাই অপেক্ষাকৃত অন্ধকার। ঘরে আলো বলতে দু'দিকে ঢাকা স্ট্যান্ড থেকে যা। শ্রীমতী গাউরের মুখে বেশ অনেকগুলি বসন্তের দাগ থেকে গেছে।

কনকলতাই শুরু করলেন।

'এবার আপনি অনেকদিন পরে কনট্যাক্ট করলেন।'

'না।' গলা ঝেড়ে উমেশবাবু বললেন, 'পরপর দু রবিবার না পেয়ে, পরশু এবং কালও ফোন করেছিলাম। রাত ১০টার সময়।'

'হ্যাঁ, আমার ফোনটা খারাপ ছিল। একুশ দিন পরে, এই একটু আগে ঠিক হয়েছে। কেব্‌ল ফল্ট।'

'চিঠি পাননি?'

'চিঠি?'

'আশ্চর্য! ক্যুরিয়ারে পাঠিয়েছি!'

শ্রীমতী গাউরের বয়স বছর ৩৫ হলেও, ১০ বছর পরের জরা তাঁর মুখে-চোখে এখন থেকেই ফুটে উঠতে শুরু করেছে, পাতলা গড়নের ছোটখাটো মানুষ, একটু কুঁজো। তাঁর পরনে সবুজ-পাড় টাঙ্গাইলের ওপর ঘিয়ে-রঙা সুতির হাউসকোট, পায়ে শোয়েডের স্লিপার। চোখ ক্ষুদ্রাকার, মৃত ও বলিরেখাময়। কিন্তু, কপালে ঘোমটার ফেট্টি না থাকা সত্ত্বেও সব মিলিয়ে কেমন একটা মাদার টেরিজা এফেক্ট, যা সম্ভ্রম জাগায়। গায়ের রঙ পানসে সাদা, যদিও পক্স-মার্কগুলি কালচে। তাঁকে দেখে অন্তত যৌবনকালেও যে সুন্দরী ছিলেন, এমনটা ভাবা কঠিন।

শ্রীমতী গাউরের ফ্ল্যাটে প্রতি রবিবার এই রাত-১০টার ফোনটা প্রতিবেশী বাসিন্দাদের কাছে বিশেষ কৌতূহলের বিষয়। সারা দিন কোনও ফোন নেই। সারা সপ্তাহ। শুধু রবিবার রাত ১০টা বাজলেই— কিরিরিং... কিরিরিং। এবং দু'বারের বেশি কখনও বাজে না। রবিবার রাত ১০টার আগেই প্রতিবেশীরা জানে, ২নং ফ্ল্যাটে ফোন বেজে ওঠার সময় এগিয়ে আসছে। অনেকেই অনুমান করেছেন এবং তা সঠিকও, যে, শ্রীমতী গাউর ওই সময় ফোনের পাশেই বসে থাকেন। কেন না, দু'বারের বেশি রিং বাজতে ক্বচিৎ শোনা গেছে। শ্রীমতী গাউরকে প্রতি রবিবার রাত ১০টায় এই ফোনটা করে থাকেন উমেশবাবু। তাঁকে নিয়োগ করার সময় অন্যতম শর্ত ছিল এটাই যে, প্রতি রবিবার রাত দশটায়, তিনি যেখানেই থাকুন, একটা কল করবেন এবং তাঁর একক তদন্তের অগ্রগতির রিপোর্ট দেবেন। এ-ছাড়া, আগেই বলা হয়েছে, ২নং ফ্ল্যাটে আর কোনও ফোন আসে না বলতে গেলে। ক্বচিৎ এলেও সেগুলি অনেকক্ষণ ধরে বেজে যায়। বেজে বেজে থেমে যায়।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

উমেশ সামন্ত নামটা পাঠকদের অনেকেরই শোনা-শোনা লাগছে। লাগবারই কথা। ৮০-দশকের মাঝামাঝি আইভি সোম হত্যা রহস্যের কিনারা করে তিনি বিখ্যাত হয়েছিলেন। খুনি বিখ্যাত পক্ষিতত্ত্ববিদ অধ্যাপক সুনীলবরণ ভাওয়াল। তিনি ওই ভয়াবহ খুনের কিনারা করেছিলেন পক্ষিতত্ত্ববিদ-ব্যবহৃত বায়নাকুলারের কাচে লেগে-থাকা বারিবিন্দুর সামান্য দাগের সূত্র থেকে। পক্ষিতত্ত্ববিদ বলেছিলেন, টুমাংডুংরির শালবনে তিনি ওই দিন ঢুকেছিলেন একটি হাতখানেক লেজের মালিক এক দুধরাজের খবর পেয়ে। তখন ভোরবেলা। ঘণ্টাখানেকের মধ্যেই তিনি বেরিয়ে আসেন। কিন্তু, তখন তো আকাশ আলোয় আলো। বরং, আইভি সোম যখন খুন হয়, দুপুরবেলা, জঙ্গলের মধ্যে, অঝোরে বৃষ্টি হচ্ছিল তখনই। এত সামান্য সূত্র থেকে (বায়নাকুলারের কাচে বৃষ্টি-ছাঁটের শুকনো দাগ থেকে) এমন একটি রোমহর্ষক খুনের কিনারা— বিচারক তাঁর ২৪ পৃষ্ঠা ব্যাপী রায়ে তদন্তকারী অফিসারকে প্রায় দেড় পৃষ্ঠা ধরে ভূয়সী প্রশংসা করেন। শ্যালিকা আর জামাইবাবুর কিস্‌সা, তদুপরি নায়ক বাংলার সালিম আলি, তাই দিনের পর দিন কাগজে কেস-রিপোর্ট নাটকীয় ঢঙে বেরতে থাকে।

একটু ধরিয়ে দিলে, বিস্মৃতিপরায়ণ নন এমন অনেকেরই ঘটনাটির বিস্তৃত বিবরণ মনে পড়বে। গড়িয়া বাঁশদ্রোনি নিবাসী এই নিঃসন্তান অধ্যাপক-দম্পতি ছিলেন ঘোর মদ্যপায়ী। মদ্যপানোত্তর তাঁদের নিশি-কলহ ছিল নিত্যদিনের ব্যাপার এবং নিশ্ছিদ্রভাবে বন্ধ ফ্ল্যাটের মধ্যে পরস্পরের প্রতি ঘরোয়া মিসাইল ছোঁড়াছুঁড়ির জন্য তাঁরা ছিলেন বিশেষভাবে প্রসিদ্ধ। একদিন নেশাপ্রসূত উতরোলের এক আবেগঘন মুহূর্তে অধ্যাপক অনূঢ়া শ্যালিকার সঙ্গে তাঁর গোপন প্রণয় তথা সাম্প্রতিক গর্ভসঞ্চারের বিষয়টি সহধর্মিণী সমীপে পেশ করলেন। ব্যাকুল, কাছাখোলা স্বামীকে বরাবরের মতো দায়মুক্ত করার ভার কাঁধে তুলে নিলেন অধ্যাপিকা-পত্নী (যতদূর মনে পড়ে, নাম রেবা ভাওয়াল), দায়িত্ব নিলেন গর্ভপাতের। নার্সিংহোম, দিনক্ষণ সব ঠিক করে, গালুডিতে বোনকে নিয়ে তিন দিনের ক্রিসমাস কাটাতে গিয়ে দাম্পত্য সিদ্ধান্ত গেল বদলে। জঙ্গলে নিয়ে গিয়ে অধ্যাপক ভাওয়াল খুন করলেন শ্যালিকা আইভি সোমকে। সাহায্য করলেন পতিপ্রাণা স্ত্রী। ওঁরা উঠেছিলেন ফরেস্ট বাংলোয়। মর্নিং সেশনে তিনজনে অন্তত দেড় বোতল ভোদকা পান করেছিলেন বলে প্রকাশ। কে কতটা, যদিও বলা মুশকিল।

যাই হোক, এহ বাহ্য। তবে এততেও যাঁদের ঘটনাটি মনে পড়ল না, যাদুগোড়ার বিরাট জঙ্গলের মধ্যে তিনদিন-তিনরাত লুকিয়ে থাকা রোগা-পটকা খুনিকে ঝোপ থেকে টেনে বের করে দৈত্যাকার পুলিস অফিসারের কিংকঙ স্টাইলে মাথার ওপর তুলে-ধরা সেই অনির্বচনীয় ছবিটি আশা করি তাঁরা ভোলেননি। তিনদিনের সাসপেন্স স্টোরির পর, প্রতিটি বাংলা কাগজ প্রথম পাতায় ছবিটি ছেপেছিল। (যদিও যাঁরা ইংরেজি কাগজ পড়ে থাকেন তথা অভিজাত, তাঁরা ও-রসে বঞ্চিত হন।)

বলা বাহুল্য ওই কিংকঙই এই উমেশ সামন্ত। রিটায়ার করার পর তাই, প্রাইভেট গোয়েন্দা হিসেবে একের পর এক ক্লায়েন্ট পেতে উমেশবাবুকে একটুও বেগ পেতে হয়নি। শ্রীমতী গাউরের কেসটি তারই অন্যতম। এবং, এও ঠিক যে, এত দুর্ভেদ্য, এ-হেন জটিল, এত অনির্ণেয় কেস চাকরি-জীবনেও তাঁর হাতে দুটো আসেনি।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

২/স্ফিংকসের হাসি

'ম্যাডাম', একটা সরু ছ'ইঞ্চি লম্বা চুরোটে প্রাথমিক অগ্নি-সংযোগ করে তিনবার ধোঁয়া ছাড়ার সময় জুড়ে চুপ করে রইলেন উমেশবাবু। তারপর আবার জানতে চাইলেন, 'আপনি আমার চিঠি পাননি?'

'নান্-না তো। কী ছিল আপনার চিঠিতে?'

গলা টিপে ধরতে যাওয়ার আগে আক্রান্তের অস্ফুট আর্তনাদ শুনতে পেলেন উমেশবাবু, কনকলতার ব্যর্থস্বরে। যেভাবেই হোক, উনি টের পেয়েছেন, উমেশবাবু কী বলতে যাচ্ছেন। আর উমেশবাবুও ঠিক তাই বললেন। কিন্তু যা বললেন, যেভাবে বললেন, তার ভাষা এবং উপস্থাপনায় বোঝা গেল, একেবারে শুরুতেই শেষ কথা বলে দেওয়ার ব্যাপারটা তিনি ভেবে এসেছেন।

'আমি আপনার কেসটা ছেড়ে দিয়েছি।'

এরপর, ঠিক যা ভেবেছিলেন উমেশবাবু।

আলোর চেয়ে বেশি অন্ধকারে ভরা দু'নম্বর ফ্ল্যাটের প্রশস্ত ড্রয়িংরুমে নেমে আসে চতুর্থ মাত্রার এক অশরীরী উপস্থিতি— এক উতরোল নীরবতা!

বেশ কিছুক্ষণ পরে ও-প্রান্ত থেকে নড়ে-চড়ে বসার শব্দ ভেসে এল।

'কিন্তু কেন?' বোঝা গেল এক অবাক বেদনায় কনকলতার কণ্ঠস্বর ফেঁসে গেছে।

'ম্যাডাম', চেন স্মোকার শ্রীযুক্ত গাউরের কাট গ্লাসের প্রকাণ্ড অ্যাশট্রেতে চুরোট নামিয়ে রাখলেন উমেশ সামন্ত, 'আমার হাতে এখন ছটি, না, পাঁচটি কেস থাকলেও, গত ছ'মাস ধরে শুধু আপনার কেসটাই আমাকে ব্যস্ত রেখেছিল। চালতাবাগানের গয়না-চুরির কেসটা তো আমি ক্লায়েন্টের বাড়িতে বসে প্রথমদিনেই ডিটেকশান করে দিলাম। বাকি কেসগুলো নেহাতই মামুলি, এক ওই আমেদপুরে ময়ূরাক্ষী নদী থেকে তোলা ট্রাঙ্কের ভেতর পাওয়া ডেডবডির কেসটা। ডি-জি আই-বি নিজে ডেকে আমাকে কেসটা দেখতে বললেন। হ্যাঁ, অফিস এখনও আমাকে ভোলেনি, আর এ-রকম সাহায্য আমি আজও করে থাকি। তবে, ওটাও ছিল খুব সহজ কেস। কেন না, নদীর নিচে দু'মাসে বডি বলতে কিছু না থাকলেও, ট্রাঙ্কের ভেতর একটা কানের ফুল পড়ে আছে দেখলাম আর সেটাই কারও চোখে পড়েনি। অবশ্য কাদা আর বালির মধ্যেই লুকিয়ে ছিল সেটা। এমনকি এ-কেসটাও আমি আমার অ্যাসিস্ট্যান্ট বংশলোচনের হাতে তুলে দিই— যদিও সবসময় অ্যাডভাইস নিয়ে গেছে। বংশ জাল এক রকম গুটিয়ে এনেছে। শুধু রিপোর্ট লেখা বাকি।

'কিন্তু, ম্যাডাম, শুধু আপনার কেসটাই, দিনের পর দিন, আমার কাছে ক্রমেই আরও জটিল, আরও রহস্যময়, আরও দুর্জ্ঞেয় হয়ে উঠতে লাগল। সে-সব ইন-ডিটেলস আপনার জানার দরকার নেই যে কীভাবে একটার পর একটা হাতছানি লাগাম হাতে সহিসের মতো আমাকে নিয়ে গেছে একটা থেকে একটা মরীচিকার কাছে— জল একদম টলটলে, কিন্তু', দীর্ঘশ্বাস ফেলে চুরোট তুলে নিলেন উমেশবাবু, 'মুখ দিতে গেলেই মরুভূমি।'

উমেশ সামন্তর এ-রকম বাগ্মিতার সঙ্গে কনকলতা অপরিচিত নন। তিনি এ-রকম নিখুঁত ছবি-কথা ওঁর কাছ থেকে আগেও পেয়েছেন। একদম টায়ে-টায়ে ফুটে ওঠে, যা বলতে চাইছেন।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

তিনি বংশলোচনের কাছে শুনেছেন মহেশ ভরদ্বাজ ছদ্মনামে পুলিসি অভিজ্ঞতা থেকে চাকুরি-জীবনেই উনি বেশ কয়েকটা তদন্ত কাহিনী লিখেছিলেন বিভিন্ন রহস্য-পত্রিকায়। আইভি সোম হত্যা কাহিনী নিয়ে লেখা ওঁর 'আঁধার রাতের কল্লোল' উপন্যাসটি নাকি এক সময় এক বছর ধরে বেস্ট সেলার ছিল। টানা ১৫ বছর ধরে কলকাতায় থাকার সুবাদে বাংলা অনর্গল বলতে, বুঝতে, এমনকি কষ্ট করে পড়তে পারলেও, আজকের 'মরীচিকা'-শব্দটি কনকলতার অপঠিত লাগল, তথা বহুশ্রুত লাগল না। কিন্তু 'মরুভূমি', 'সহিস'— এগুলির সাহায্যে, দুঁদে পুলিস অফিসারের সর্বগ্রাসী হতাশার ধূসর ছবিটি তবু তাঁর ভিনভাষী মনে অক্ষরে অক্ষরে ফুটে ওঠে।

উমেশবাবু বলে চলেছেন—

'তাই দীর্ঘ ছ'মাস পরে অবশেষে সেই সময় এসেছে, যখন মনে হচ্ছে, এ-বোঝা আমার ঘাড় থেকে নামিয়ে দিই— আর তাতে সম্মতি জানিয়ে আপনি আমাকে সাহায্য করুন নামাতে। কারণ, পুলিস যতটুকু জেনেছে, যতদূর গিয়ে ফিরে এসেছে, এ তো দেখছি, বারবার আমি হাজির হচ্ছি সেখানেই। আর সেখান থেকে ঘাড় হেঁট করে ফিরে আসছি বারবার। ম্যাডাম, আপনার এই কেস, এ যেন স্ফিংকস-এর হাসি, নাক ভেঙে দিয়েছে, তবু সময় এখনও তার হাসি মুছে দিতে পারেনি। প্রথম তিন মাস তো আমি এক-পা এগতেই পারিনি। সেবারেই ইন্দোর থেকে ভায়া বোম্বে ফিরে এসে, হোটেল-প্লেনভাড়াসুদ্ধু মোটা বিলটা পাঠাবার সময় এই সিদ্ধান্ত প্রায় নিয়ে ফেলেছিলাম যে, আর না। যদিও ইনসিডেন্টাল বিল যখন যা পাঠাচ্ছি আপনি অম্লান মনে তার এগেনস্টে চেক দিয়েই যাচ্ছেন, মাসে মাসে রিটেনারও আমার অ্যাকাউন্টে জমা পড়ছে ঠিকমত—'

'না-না।' এইখানে বাধা দিলেন কনকলতা, 'কক্ষনও না। ওই একটা ব্যাপার নিয়ে আপনি কিছু ভাববেন না। সেটা আমার চিন্তা। উনি যা রেখে গেছেন তার শেষ কানাকড়ি পর্যন্ত আমি খরচ করতে তৈরি আছি। এখন তো জাস্ট টাকাটায় হাত দিয়েছি। এরপর গয়নায় হাত পড়বে। তারপর গাড়ি। আমি ফ্ল্যাট বিক্রি করে ওই রাস্তাটায় গিয়ে দাঁড়াব। কিন্তু, আমি তো বলেছি আপনাকে'... এইখানে উমেশবাবুর মনে হল মিসেস গাউর মানে কোনও মানুষ নয়, কনকলতা মানে ইস্পাত-কঠিন এক প্রতিজ্ঞা, 'আমি এর শেষ দেখবই দেখব।'

'এই, এটা' নেবা চুরোটে পুনর্বার অগ্নি-যোগ করবার প্রয়োজন অনুভব করলেন উমেশবাবু, 'আপনার এই দৃষ্টিভঙ্গিটাই আমাকে বারবার অনুপ্রাণিত করেছে, এই আত্মপ্রত্যয়। আর এটাই আমাকে কিছুতেই হাল ছেড়ে দিতে দেয় না মিসেস গাউর।'

এইখানে কনকলতা বিড়বিড় করে স্বগতোক্তি শুরু করলেন— 'নাইনটিন নাইনটির নাইনথ জানুয়ারি ডাঃ গাউর ডিস্যাপিয়ার করলেন। বাড়ি থেকে ভোর ৬টায় লেকে হাঁটতে গেলেন শর্টস অ্যাডিডাস আর সাদা টি-শার্ট পরে—'

'হ্যাঁ, স্পেশাল সুপারিনটেনডেন্টের নামে তখন রোজ লোকেশ গাউর-এর অ্যানাউন্সমেন্টটা হত— আমি তখনও চাকরিতে। নিরুদ্দিষ্ট তো এ-রকম পোশাকে বড় একটা হারিয়ে যায় না। তার ওপর ডাক্তার। আমার খুবই ইন্টারেস্টিং লাগত। অবশ্য, ওটা ছিল ক্যালকাটা পুলিসের এক্তিয়ারের ব্যাপার। আমাদের আই বি-র নয়।'

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

'কিন্তু', কোলের কাছে একটি শাড়ির ভাঁজ মসৃণ করছিলেন কনকলতা, অনেকক্ষণ থেকেই। নতমুখে বললেন, 'পুলিস, তিন বছরে যা করতে পারল না, আপনি তো ছ'মাসে সেই তুলনায় অনেক কিছু করলেন। অনেক জানলেন।'

'দেখুন মিসেস গাউর' উমেশবাবু বললেন, 'ওই ওটুকু আমি আরও আগেই করতে পারতাম, যদি আপনি আমাকে বলতেন উনি লেকে না ঢুকে সোজা চলে গিয়েছিলেন ল্যান্সডাউনে, ওঁর চেম্বারে। আর সেখান থেকে একটা ফোনও করেছিলেন আপনাকে, আর কিচেন-ক্লোজেটের একটা বিস্কুটের টিনে যা টাকা আছে—'

'এক লক্ষ সামথিং—'

'হ্যাঁ। সেটা ড্রাইভারের হাতে পাঠিয়ে দিতে বলেছিলেন। এটা আগে জানলে—'

শাড়ির আর একটি ভাঁজে মনোনিবেশ করে কনকলতা বললেন, 'দেখুন, ওই ধরনের টাকার কথা তো স্বীকার করা যায় না। তখনও তো চিনি না আপনাকে, ভাল করে।'

চুরোটের ছাই দেড়-ইঞ্চির মতো হয়ে গেছে। এখনও ঝরে পড়ার নাম নেই। দরজায় বেল। ৯-রকম শব্দ হয়। হংকঙের ফ্যান্সি মার্কেটে কেনা। ডাঃ গাউরের শখের জিনিস। এখন বুলবুলির গলায় বৃষ্টি-ভেজা ভোরের শিস।

ভগীরথ ফিরল অফিস থেকে। গাড়িটা ভাড়া দেওয়া হয়েছে লারসন অ্যান্ড টুর্বোকে। অন্যতম ডেপুটি অ্যাকাউন্ট্যান্ট আই আই চিদাম্বরম ব্যবহার করেন। ক্বচিৎ অন্যথা হয়, নইলে মাদ্রাজি ব্রাহ্মণ আলিপুরের গৃহকোণে সন্ধ্যার আগেই ঢুকে পড়েন এবং ভগীরথের গাড়ি গ্যারেজ করতে এত দেরি হয় না। মাস দুই হল কাজে লেগেছে ছেলেটি।

'কফি খাবেন স্যার?'

'হ্যাঁ। ব্ল্যাক। চিনি দেবে না।'

'ইয়ে স্যার।'

মাইক্রোওয়েভে কফি করে আনতে ভগীরথের পাঁচ মিনিটও লাগে না। কনকলতার জন্যে একটা কোল্ড ড্রিঙ্কস-এর খানিকটা ভ গ্লাসে ঢেলে সে মাঝখানের ঘরে টিভি খুলল। চেনা সিগনেচার টিউন— 'সমাচার' শুরু হচ্ছে। রাত ৮টা।

'যাক। এটা জানতে পেরে, যে, ডিসপেনসারিতে আগে থেকে রাখা একটা পাঞ্জাবির ছদ্মবেশ পরে ডাঃ গাউর ব্রিফকেস হাতে বেরিয়ে গেছেন— একটা ট্যাক্সি করে—'

'হ্যাঁ, এত নিখুঁত যে গাড়িতে বসে ড্রাইভারও'—

'চিনতে পারেনি। জানি আমি। তখন কে যেন ড্রাইভার ছিল?'

'ছোট্টু। ছোট্টু সিং।'

কফিতে শেষ চুমুক দিয়ে, রুমাল বের করে মুখ মুছে নিয়ে, ডান ও বাম গুম্ফপ্রান্তে দু'বার সুখ-পাক দেন প্রাক্তন দুঁদে গোয়েন্দা। এই সময় চুরোট থেকে ছাই পড়ে সকলের অজান্তে। দেখা যায়, এখনও নেবেনি।

'ম্যাডাম, আপনার ডিনার ক'টায়?'

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

'না-না। আপনি বসুন। হ্যাঁ, আমি দুঃখিত আপনাকে না জেনে ট্রাবল দেওয়ার জন্যে।'

'মেয়েটি, যে সকালে খোঁজ করতে এসেছিল, যদি এটাও বলতেন—'

'আমি জানব কী করে বলুন। আমি তো জানি পেশেন্ট। আমি সন্ধেবেলা চেম্বারে যেতে বললাম।'

'লেকে বেড়াতে গিয়ে অত ভোরে মেয়েটাকে গেটের সামনে দেখেই হাওয়া হয়ে যান ডাঃ লোকেশ। কুয়াশাও পড়েছিল সেদিন।' চুরোটের ধোঁয়া ডান হাতে নাড়িয়ে দিয়ে উমেশ সামন্ত বললেন, 'ভীষণ! আমি খবর নিয়েছি।'

'হ্যাঁ। অন্তত ৭টা পর্যন্ত ছিল। কুয়াশার মধ্যেই মিলিয়ে গেল মেয়েটি। এখান থেকে যখন ফিরে গেল।'

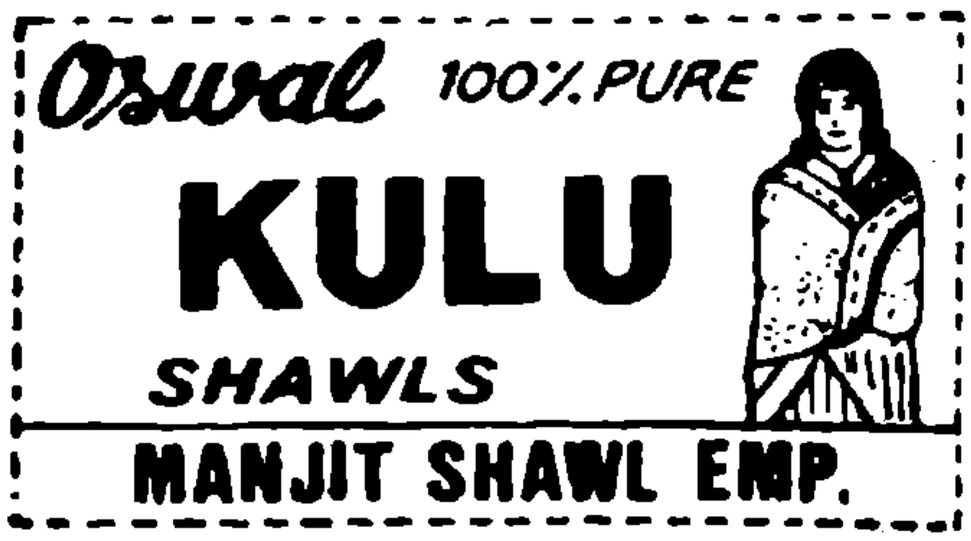

'এক্সকিউজ মি।' কনকলতা উঠে দাঁড়ালেন। শয়নকক্ষ থেকে ফিরে এলেন ইন্দোরে-কেনা একটা মহার্ঘ সাতুস চাদর গায়ে। লাদাখ পেরিয়ে সুদূর পাহাড়ি অঞ্চলে হয় এগুলো। জাঁসকর উপত্যকায়। কী যেন নাম, মনে পড়ল না। এগুলো এত হালকা আর পাতলা যে হাতের মুঠোয় ধরা যায়।

উমেশবাবু দুঃখ করে বললেন, 'কিন্তু তার দিন সাতেক আগে জয়ন্তীর ভাই এসেছিল—'

'দেখুন, ঘটনার প্রায় তিন বছর পরে আমার যতদূর যা মনে পড়ে সবই বলেছি আপনাকে। ওর দাদা, —কী যেন নাম?'

'সুব্রত'।

'আ-হ্যাঁ, সুব্রত। একদিন হঠাৎ একটা ইয়াং ছেলে এল, ডাঃ গাউরের খোঁজ করতে— তখন সন্ধেবেলা। আমি তাকে চোখেও দেখিনি। সেও তো বলে ছিল তার বাবার চেস্ট পেইন। উ বললেন, কিন্তু ডাঃ গাউর তো গাইনি। সে বলল, তা হোক, কিন্তু ডাক্তার তো।' এক দীর্ঘশ্বাস চেপে ছোট্ট করে কনকলতা বললেন, 'বলেছিল, এমারজেন্সি।'

'কিন্তু সেই সেসময় ডাঃ গাউর বললেন, ডাঃ গাউর ওঁর ছোটভাই, আর সে গেছে বাঙ্গালোরে, সেমিনারে, কবে ফিরবে ঠিক নেই— তখনই তো সন্দেহ হওয়া উচিত ছিল আপনার।'

'গাউরজি আমাকে বলেছিলেন, 'ওঁর শরীর খারাপ লাগছে, তাই কলটা নিলেন না। আমি কী করে সন্দেহ করব? অথচ', এবার আর বাধা দিলেন না। বুক যত ফুলতে চায় ফুলতে দিয়ে প্রশ্বাস নিতে নিঃশ্বাস মোচন করতে দিলেন কনকলতা, 'পরদিন ভোরেই নিরুদ্দেশ হলেন ডাঃ গাউর।'

'শুনুন মিসেস গাউর। একটা নতুন ইনফরমেশান আমি পেয়েছি। জয়ন্তী সেদিন দাদার সার্ভিস রিভলভারটা সঙ্গে নিয়ে গিয়েছিল। ছ'টা গুলি ভরেছিল নিজের হাতে। আনাড়ি হলেও সেদিন

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ওই ভোরবেলায় ডাঃ গাউর নিশ্চয়ই খুন হতেন ওর হাতে। যদিও, ওর দাদা সুব্রত এসেছিল ডাঃ গাউরকে পেটাতে।' উমেশবাবু বললেন, 'স্রেফ পেটাতে।'

এর আগেই চোখের কোণে কয়েকবার আঙুল রেখেছেন কনকলতা। অন্ধকারে বোঝা যায়নি। এবার ফুঁপিয়ে কাঁদতে শুরু করলেন। কান্নার মধ্যে দিয়ে কখনও তীক্ষ্ণ, কখনও ধরা গলায়, কখনও বা জড়িত স্বরে উনি যা বললেন, তার মর্মার্থ হল, ওই মেয়েটি, যার নাম জয়ন্তী বসুরায়, তাকে খুঁজে পেতেই হবে উমেশ সামন্তকে। সে যদি এ-দেশে থাকে ভাল। দরকার হলে বিদেশ যেতে হবে উমেশবাবুকে। তিনি সেজন্যেও প্রস্তুত আছেন। কারণ, জয়ন্তী ধরা না পড়লে, সুব্রতকে না ধরতে পারলে, ডাঃ লোকেশ গাউরের বেঁচে থাকার কোনও সম্ভাবনা নেই। মানে যদি না তারা তাঁকে ইতিমধ্যেই বিধবা করে না থাকে।

৩/ইউক্লিডীয় সূত্র

এই জয়ন্তী আর সুব্রত বসুরায়ের নাম জানতে পারাটাই ছিল সেই সুতো যা সব জটের কোথাও না কোথাও লুকিয়ে ঝুলে থাকে। এই সূত্র ধরে টানাটানির পরবর্তী অধ্যায়টি কিন্তু বেশ জটিল এবং দাবি করে অখণ্ড মনোযোগের, তবে কিনা সবার আগে প্রথমে এটা খুঁজে পাওয়া চাই-ই। এরপর সেই সুতোর প্রতিটি টানা এবং ছাড় হওয়া দরকার যথাযথ এবং নির্ভুল— সমাধান-সূত্র ধরে, যেখানে যেমন, যখন যতটুকু, তার চেয়ে একটুও বেশি বা কম টানাপোড়েনের ফলে কত তদন্তের যে আঁতুড়েই মৃত্যু হয়েছে তার ইয়ত্তা নেই।

তবে, তাঁর জীবনের এই দুরূহতম তদন্ত-কাজে জয়ন্তী আর সুব্রতর অস্তিত্বের খোঁজ পাওয়ার ব্যাপারটায় উমেশবাবুর কৃতিত্ব একটুও ছিল না। এ-খবর এসেছিল আক্ষরিকভাবেই আকাশ থেকে। গায়ত্রী-মন্ত্রে যেমন আছে, সকল বেদের মধ্যে যিনি ওঙ্কার, সেই সর্বত্রগামী সেই পরমজ্ঞানী তাঁর অনন্ত ধী-শক্তির কৃপাকণা প্রেরণ করেছিলেন বলেই সঠিক পথে প্রথম পদক্ষেপ রাখা গিয়েছিল। তার আগের প্রথম ছ'মাসের ইতিহাস শুধু ব্যর্থতার পর ব্যর্থতা।

কেস হাতে নিয়ে উমেশ সামন্ত প্রথমেই যোগাযোগ করেন স্পেশাল ব্র্যাঞ্চের সুপারিনটেনডেন্ট ওবেয়দুর রহমানের সঙ্গে। প্রায় তিন বছর আগে, ৯ জানুয়ারি ১৯৯০, ডাঃ গাউরের অন্তর্ধানের কেসটির সর্বময় দায়িত্ব তাঁর হাতেই ছিল। পুরনো কলিগ, উমেশ সামন্ত রিটায়ার করার সময় ছিলেন তিনিও অ্যাসিস্ট্যান্ট কমিশনার। কেস তাঁর হাতে এসেছে শুনে খুশিই হলেন, এবং যখনই প্রয়োজন হবে সর্বশক্তি দিয়ে পুলিস তাঁর সাহায্যে এগিয়ে আসবে বলে প্রতিশ্রুতি দিলেন। নানান ফটোগ্রাফ ও বিবিধ ডকুমেন্টে ভরা মোট ১৩০ পাতার ফাইলটি দেখার সুযোগও দেওয়া হল তাঁকে।

রেকর্ড রুমে একা বসে ফাইলে মনোনিবেশ করলেন তিনি।

কিছুদূর অগ্রসর হয়েই উমেশবাবু বুঝতে পারলেন, পুলিস শুরু থেকেই এগিয়েছে অ্যাকাডেমিক কায়দায়। তা থেকে এমন কিছু সূত্র তিনি পেলেন না, যা ধরে মৃদু টান দিয়েও

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

দেখতে ইচ্ছা হয়। ৭৯ পৃষ্ঠায় এসে একটি নোটে দেখা গেল, ইনস্পেক্টর নাথ জানাচ্ছেন, 'মনে হয় ইন্দোরেই এমন কোনও সাঙ্ঘাতিক ঘটনা ঘটেছিল যার জের পনের বছর পরের এই নিরুদ্দেশের ঘটনায় প্রতিফলিত হয়েছে।' নাথ-এর ইংরেজি ভাষার ওপর দখল অফিসে ছিল কিংবদন্তী। চমৎকার নোট, ভাষার দিক থেকে। 'কেন না', নাথ লিখেছে, 'তাঁর কলকাতার জীবন একেবারে ক্লিন স্লেট।' কিন্তু, মন থেকে ঠোঁটেও একটু হাসি এসে গেল উমেশবাবুর, কলকাতা যদি ক্লিন স্লেট হয় ব্রাদার, তাহলে ইন্দোর তো ধোয়া তুলসীপাতা! কলকাতায় কিছু না পেয়ে, উমেশবাবুও তো দৌড়েছিলেন ইন্দোরে! কই, সেখানেও তো সন্দেহ হতে পারে এমন একটি সূত্রেরও হদিস পেলেন না! হ্যাঁ, কনকলতার সঙ্গে বিয়ের ব্যাপারে দুই পরিবারে যথেষ্ট মনোমালিন্য হয়েছিল বটে। কনক পুরনো ইন্দোর ঘরানার মেয়ে। বাড়ি খান নদীর ধারে ছত্রীগড়ে। বোম্বে থেকে সদ্য পিতৃমাতৃহীন তরুণ লোকেশ চলে এল দিদির বাড়িতে— কলেজেই পরিচয় ও প্রেম। তখন পুলিস কেস পর্যন্ত গড়িয়েছিল, তাও ঠিক। কিন্তু, আড়াই বছর পরে লোকেশ যখন গেলেন, বাড়ি জুড়ে তো মড়াকান্না পড়ে গেল। যেন, এই প্রথম দুঃসংবাদ পেলেন তাঁরা। ও-ছাড়া তিনপুলিয়ার মোড়ে এক অটো-চালকের হাত মুচড়ে ভেঙে দেওয়ার কারণে একটা এফ আই আর। পুলিসের মধ্যস্থতায় দেড় হাজার টাকা ক্ষতিপূরণ দেওয়া হয়।

ফাইলে 'বম্বে গাইড' নামে ট্যুরিস্টদের জন্য একটা দ্রষ্টব্য স্থান তথা পথ-নির্দেশিকা সাঁটা রয়েছে দেখলেন উমেশবাবু। উমেশবাবু ফাইল হাতে উঠে গেলেন ইনস্পেক্টরস রুমে।

'এটা কী জন্যে?' উমেশবাবু জানতে চাইলেন, 'এখানে?'

'ওটা?' হাত নেড়ে সিগারেটের ধোঁয়া উড়িয়ে দিল শুভেন্দু নাথ, 'ওটা একটা বম্বের সিটি-গাইড।'

'সে তো দেখলাম। কিন্তু, এটা রেখেছেন কেন?'

'দেখবেন, কাভারে ডাঃ গাউরের লেখা একটা ফোন নাম্বার রয়েছে।'

'হ্যাঁ। সে তো দেখছি।'

'ওটার ব্যাপারে ডি আই জি-র একটা কুয়েরি ছিল। তাই রেকর্ড হিসেবে—'

'কুয়েরিটা কী ছিল?'

'কী আবার! নম্বরটা কার?' শুভেন্দু বলল, 'কয়েক পাতা এগিয়ে দেখবেন, উত্তর দেওয়া আছে।'

উমেশ সামন্ত পাতা উল্টে নোটটা দেখলেন। 'ডায়মন্ড কর্নার' নামে দক্ষিণ বোম্বের পশ এরিয়া কাফে প্যারেডের একটি বিখ্যাত জুয়েলারের দোকানের নম্বর এটা।

'ঠিক জুয়েলার নয়। ডায়মন্ডার বলতে পারেন। ওরা শুধু হীরের কারবার করে। সে কী দোকান মশায়!' প্যাকেট ছিঁড়ে গলায় আধাআধি পান-পরাগ ঢালল শুভেন্দু, তারপর বলল, 'দোকানের ছোহোট্ট।' তর্জনী আর বুড়ো আঙুলের মাঝখানে সে ইঞ্চিখানেক ফাঁক রাখে, 'এইটুকুন। কিন্তু ঢুকলে চোক ধাঁধিয়ে যায়। আগাগোড়া কুচকুচ কালো ভেহেলভেট কার্পেট, দেওয়াল কালো,

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

কর্মচারীদের পোশাক কাহালো, ডিইম লাইট— শুধু গ্লাস কেসে এক-একটা হীরে ঝকঝক ঝকঝক কোহারাছে। খরিদ্দাররাও তো আপনার...'

পিক ফেলতে শুভেন্দু উঠে গেল, বোধহয় বাথরুমও সেরে বেশ অনেকক্ষণ পরে ফিরে এসে বলল, 'সব আরব শেখ। সবায়ের গায়ে কালো জোব্বা।'

ফাইল আদ্যোপান্ত পড়ে উমেশবাবু বুঝলেন যে পুলিস এই একটা অনুমানের ভিত্তিতেই আগাগোড়া কাজ করে গেছে যে, অতীতে এমন একটা কিছু ঘটেছিল এবং তা ঘটেছে বোম্বে অথবা ইন্দোরেই— ডাঃ গাউরের কলকাতা-পূর্ব জীবনের কোনও অজানা ঘটনা— হয়ত অজানা কোনও পারিবারিক প্রতিহিংসা— যা গাউর-পরিবারের একমাত্র পুরুষ-বংশধরকে এভাবে নিখোঁজ হয়ে যেতে বাধ্য করেছে। যেহেতু তাঁর দাম্পত্য জীবনে কোনও খাদ নেই— তাই একমাত্র বোবা অতীতের মধ্যেই এ রহস্যের সমাধান পাওয়া যেতে পারে। এ-বিষয়ে মধ্যপ্রদেশের হোম মিনিস্ট্রিকে প্রপার চ্যানেলে আরও অনুসন্ধান চালাবার অনুরোধ জানাবার জন্য আই জি ক্রাইমকে অনুগ্রহ করতে বলা হয় এবং ফাইল রাইটার্সেও যায়। তারপর থেকে 'আরও তদন্ত সাপেক্ষে' ফাইলটি এতদিন শিকেয় তোলা ছিল।

কাজেই, পুলিসি তদন্ত থেকে কোনও প্রণিধানযোগ্য সূত্র না পেয়ে, উমেশ সামন্তকে একরকম শুধু হাতে নতুন করে তদন্ত শুরু করতে হল। প্রত্যেক গোয়েন্দারই একটা অনুমান-চক্ষু থাকে। একটা কিছু সম্ভাব্য সূত্র ধরে এগতে হয়। অতীতে এমন কখনও হয়নি যে, প্রখ্যাত রহস্যসন্ধানীর প্রতিটি অনুমান এভাবে অঙ্কুরেই নষ্ট হয়েছে। ওঁর দুর্ধর্ষ অনুমান-ক্ষমতাকে এভাবে পরপর ধরাশায়ী করতে পারে, এমন কেস এর আগে তাঁর হাতে আসেনি। চূড়ান্তভাবে যখন ব্যর্থ এবং মিসেস গাউরের কাছে শেষবারের মতো অব্যাহতি চাইবেন বলে সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলেছেন, এই সময় তৃতীয় শ্রেণীর গোয়েন্দা পেরি ম্যাশনের একটি রহস্য-সমাধানের কাহিনী পদ্ধতিগতভাবে তাঁর মনে পড়ে গেল, ভাগ্যিস। দি কেস অফ দা ফুট-লুজ ডল। এক অতি মৌলিক পদ্ধতিতে সেবার রহস্য-সমাধান করেন পেরি।

ইউক্লিডীয় জ্যামিতিতে সেই বিচিত্র উপপাদ্য ও তার সমাধানটি যেমন: মাস্টারমশাইরা বলেন, নেগেটিভ প্রুফ। ABC ও DEF এই দুটি ত্রিভুজের তিনটি কোণ সমান। প্রমাণ করতে হবে যে বিপরীত বাহুগুলি সর্বসম। প্রমাণ হবে এইভাবে: Δ ABC এবং Δ DEF ত্রিভুজের বাহুগুলি যদি সমান না হয় তাহলে তারা নিশ্চিত অসমান। এবার BC ভূমিকে EF ভূমির ওপর বসিয়ে Δ DEF-কে উল্টে দাও। (অঙ্কন)। আগের কোনও উপপাদ্যের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী দেখা যাবে (প্রমাণিত হবে) ত্রিভুজদ্বয় অসমান নয়। যদি তারা অসমান নাই হয়, তাহলে ত্রিভুজ দুটির সমান হওয়া ছাড়া গত্যন্তর নেই। অতএব বাহুগুলি সমান। অতএব Δ ABC ও Δ DEF পরস্পর সর্বসম (প্রমাণিত)। এই পদ্ধতিতে পেরি ম্যাশন প্রমাণ করেছিলেন যে তাহলে মিল্ডরেড ক্রেস্ট আর ফার্ল ডিসক্রোল একই মেয়ে।

কোনও গুণ নাই তার কপালে আগুন। নির্গুণ ভোলা মহেশ্বরের মতো অবশেষে তিনি ববম ববম শব্দে এই অজানা পথে নেমে পড়লেন। হাতে ডমরু।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

পুলিস যা ভেবেছে, তিনি শুরু করলেন তার একেবারে বিপরীত মেরু থেকে। প্রথম দিকে, বিপরীতাত্মক হলেও, একটা ছক ছিল। পুলিসের ধারণা বেঁচে আছেন ডাঃ গাউর। না, বেঁচে নেই। খুন হয়ে গেছেন। অতীতে সাঙ্ঘাতিক কিছু ঘটনা ঘটেছিল ইন্দোর অথবা বোম্বেতে। না, ওখানে কিছু ঘটেনি। কোনও গর্হিত কাজ যদি করে থাকেন, তবে তা করেছেন এই কলকাতাতেই, কিন্তু এখন তো মৃত। মৃত? হ্যাঁ, মৃত। (পুলিসের ধারণা 'বেঁচে আছেন')।

কিন্তু, ক্রমেই এই সব বিপরীত যুক্তিতত্ত্বও পদে পদে হতমানিত হতে লাগল। যুক্তি, বুদ্ধি ও বিশ্লেষণের নঞ্ দিয়ে বোনা যে জালই তিনি ফেলুন— শেষ পর্যন্ত দেখা যেতে লাগল, তাতে একটা মস্ত ফুটো ছিল। পাখি যদি জালে পড়েও থাকে, সেখান দিয়ে বেরিয়ে গেছে।

শেষমেশ, এই বিপরীত-চিন্তার পথে যেতে যেতে, নবম মাসের সূচনায় এমন একটা সময় এল যার পরের ধাপ অথবা সেটাই হয়ত পূর্ণ মস্তিষ্ক-বিকৃতির অবস্থা। দেওয়ালের গর্ত থেকে বেরনো রাত্রির মাকড়সা যেন, কোনদিকে যাবেন, কোথায় যাবেন, কেন যাবেন কিছুই ঠিক নেই, অথচ বেরিয়ে পড়েছেন, যেখান দিয়ে যাচ্ছেন সেটাই হয়ে যাচ্ছে রাজপথ। আর যা হোক, এভাবে গন্তব্যে পৌঁছে যাওয়ার সম্ভাবনাও একেবারে উড়িয়ে দেওয়া যাচ্ছে না। আচ্ছা, তিনি এই সময় ভাবতে শুরু করলেন, ছবি আর তথ্য বলছে, নিরুদ্দিষ্ট ডাঃ গাউর মাঝারি মাপের, রঙ শ্যামবর্ণ, চোখে শেষ যা দেখা গেছে, সানগ্লাস। ডাঃ গাউর জানেন কলকাতা এবং মধ্যপ্রদেশ পুলিস হাল ছেড়ে দিলেও, আমি, উমেশ সামন্ত, দুঁদে গোয়েন্দা, আমার প্রাইভেট আই ডিটেকটিভ এজেন্সি আবার নতুন করে খোঁজাখুঁজি শুরু করেছে। এটা তো খুবই স্বাভাবিক যে, উনি ওঁর আইডেনটিফিকেশান মার্কগুলি এখন নতুন করে মুছে ফেলছেন। তাঁর ভ্রূর পাশে আঁচিলটি তো আর নেইই, রঙ এখন অনেক ফর্সা, চোখের মণিতে মাইনাস-৮ কনট্যাক্ট লেন্স। ডায়েটিং করে যথেষ্ট রোগা হয়ে গেছেন, ফলে ঢের লম্বা দেখাচ্ছে, এমনকি। বা যে-কোনও উপায়ে কিছুটা খর্বকায়ই হয়ে গেছেন যদি ভাবি, তাহলে কী দাঁড়ায়? কোনও সুরাহা হয় কী? আজকের 'আজকাল' পত্রিকাটি যদি বিশ্লেষণ করা যায়। এদের ডোরিক বা এক-কলমি ছোট খবরগুলো বিখ্যাত। ছাইবাবা: বদ্রিনাথে অলকানন্দা নদীর ধারে ছাই মেখে বসে আছেন এক নাগা সন্ন্যাসী। গত তিন বছর ধরে তিনি মৌনী। তিন বছর? কীসের সঙ্গে মিলে যাচ্ছে না? হ্যাঁ, ঠিক তিন বছর হতে চলল নিরুদ্দেশ হয়েছেন ডাঃ লোকেশ গাউর। আর একটি ডোরিক: বন্দী বাটা। বাটা কোম্পানি আলিপুর জেলের বন্দীদের দিয়ে জুতো তৈরি করাচ্ছে। প্রথমে ২১ জন বন্দীকে কর্ম-নিযুক্তি দেওয়া হয়েছে। এখানেও তিন— ২+১। হতে কি পারে না যে, প্রাণ বাঁচাতে কোনও ছোটখাটো ক্রাইম করে আলিপুর জেলে ঢুকে বসে আছেন লোকেশ গাউর? সম্ভব! সবই সম্ভব! গর্ত থেকে বেরিয়ে যে পথে হাঁটে রাতের মাকড়সা— সেটাই রাজপথ। আর একটি ডোরিক অনুযায়ী পশ্চিমঘাট পর্বতমালার তেনকোশিতে জঙ্গল থেকে বেরিয়ে যে পাগল তিনজনকে ছুরি মেরে জঙ্গলে পালাল— তা কি সব হিসেবের বাইরে ঠেলে দেওয়া যায়? কেমন দেখতে হতে পারে পাগলটা? ফোটোগ্রাফে দেখা লোকেশ গাউর রক্তচক্ষু পাগলের বেশে তাঁর চোখের সামনে ভেসে ওঠেন— ঘাড় পর্যন্ত চুলের জটাজুট, সম্পূর্ণ উলঙ্গ। তবু স্পষ্ট চেনা যায়। আরে বাবা, উমেশ সামন্তর চোখকে ফাঁকি দেবে— চালাকি! তেনকোশি, পশ্চিমঘাট! অ্যান আইডিয়াল প্লেস ফর হায়িডিং ফর ওয়ান হু ইজ অ্যাভয়েডিং এ

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সিওর কিলার— নো ডাউট। হাওড়ার খুরুট রোডের জানবাড়িতে প্রবেশ করছেন তিনি, একদিন দেখা গেল।

৪/বিশ্বরূপ দর্শন

যুধিষ্ঠিরের কাছে বকরূপী ধর্ম জানতে চেয়েছিলেন: পরাজয় কী? উত্তরে ধর্মপুত্র জানান: জয়ই পরাজয়। যদি তাই হয়, তাহলে মানতে হয়, সম্পূর্ণ পরাজয় স্বীকারের মধ্যে নিঃসন্দেহে জয়ের আনন্দ আছে। এভাবে হেরে যেতে যেতে, সম্পূর্ণ হার স্বীকার করে, উমেশবাবুর সামনে খুলে যেতে লাগল এক সম্পূর্ণ নতুন দিগন্ত। তিনি টের পেলেন, লোকেশ গাউর অন্তর্ধান রহস্য উন্মোচন করতে পারেন শুধু তিনি, সমগ্র বিশ্বরহস্য যাঁর নখদর্পণে। এ কাজ মানুষের সাধ্যাতীত। মানুষের সমস্ত হিতাহিতজ্ঞানের যিনি উৎস, সেই চরম দুর্জ্ঞেয়কে জানার প্রথম সূত্রটির ইঙ্গিত আসতে পারে শুধু সেই পরমপুরুষের কাছ থেকে। এই নবলব্ধ যথা— নিযুক্তোস্মি বোধ তাঁর মনে জন্ম দিল নতুন আশার।

বুদ্ধি আর হতবুদ্ধি, অগ্রজ্ঞান ও বেওকুফির টানাপোড়েনে একজন কৃতসঙ্কল্প মানুষের সসেমিরা অবস্থার এ-হেন অবসানে— একদিন সত্যিই সেই অলৌকিক ঘটনা ঘটলও। স্ট্র্যান্ডে গোয়ালিয়র মনুমেন্টের পাশে ছোট্ট পার্কটায় একদিন বসে আছেন, সন্ধ্যা হয়ে গেছে। চোখের সামনে শুধু একটি বিদেশি জাহাজ আর তার সারবন্দী পোর্টহোলের আলো। হঠাৎ, বলা নেই, কওয়া নেই, জাহাজের গা থেকে ঝোলানো দড়ির সিঁড়িটা ভীষণভাবে দুলে উঠল। তাকিয়ে দেখলেন, নিঃশব্দ গড়ানে মেঘে আকাশ কখন ভরে গেছে। অথচ, মেঘ একবারও ডাকেনি। বিদ্যুৎ ঝলসায়নি।

আকাশ ভরিয়ে ফেলা এই বিপুল মেঘরাশি! উমেশবাবুর তৎকালীন মানসিক ভারসাম্যহীনতা তাঁকে সত্যিই ভাবাল, আচ্ছা, ওই মহামৌন মেঘপুঞ্জ, যা নাকি এমন নিঃশব্দে গোটা আকাশের দখল নিচ্ছে— ওরা পারে না কিছু জানাতে? পুঞ্জীভূত কালো মেঘের আত্মা যে অচঞ্চল পাখি, সে কি পারে না তার ডানা থেকে একটি হীরের পালক খসিয়ে দিতে? পুরীর সমুদ্রতীরে সূর্যোদয়ের জন্য অপেক্ষমাণ মানুষের মতো, উমেশ সামন্ত বেঞ্চি ছেড়ে উঠে দাঁড়ালেন।

যেই না দাঁড়ানো, আশ্চর্য, অমনি মেঘের মধ্যে মৃদু প্রথম গুরুগুরু, আর কোথা থেকে যে ঝাঁপিয়ে পড়ল এক প্রবল ঝড়, পরাক্রান্ত দুই হাতে বিড়াল ছানার প্রায় নড়া ধরে তুলে নিল বোধ ও অবোধ, তাঁর দুটোকেই। তার দু'হাতের ঝাঁকুনি খেতে খেতে অবাক বিস্ময়ে তিনি দেখতে পেলেন, প্রথম বিদ্যুতের আলোর আঁচড়ে, চলমান মেঘের গায়ে ফুটে উঠছে কয়েকটি অতি-আকৃতির সংখ্যা: 6129966.

কেউ বিশ্বাস করুক আর না করুক, লোকেশ গাউর অন্তর্ধান রহস্যের প্রথম ইশারা এভাবেই এসেছিল। এ-ভাবে, আক্ষরিক অর্থে, আকাশ থেকে। ওরাই জানাল। ওই মেঘ। আর ওই বিদ্যুৎ।

যে-কোনও সাইকিয়াট্রিস্ট বলবেন, মেঘ নয়, আকাশ নয়, উমেশবাবুর মাথার মধ্যেই ফুটে উঠেছিল অক্ষরগুলি। সেই মুহূর্তে তিনি ছিলেন হাইপোকন্ড্রিয়াসিস-এর তুরীয় অবস্থায়। তাই ওই

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

রকম দেখেছিলেন। কিন্তু উমেশ সামন্ত তা কিছুতেই মানতে পারেন না। তিন মাস আগে বোম্বের সিটি-গাইডের প্রচ্ছদে এক পলকের জন্য মাত্র একবার দেখেছিলেন ফোন-নাম্বারটি। এর মধ্যে বারেকের জন্যেও তো মনে পড়েনি। ঠিক ৯০ দিন পরে, বাহ্যজ্ঞান সম্পূর্ণ হারিয়ে যখন তিনি অনন্তবাহু ও শশিসূর্যনেত্র ত্বয়া হৃষীকেশকে মেঘস্বরূপে চিনতে পারলেন ও নতমাথায় এবং কৃতাঞ্জলিপুটে কাঁপতে কাঁপতে উঠে দাঁড়ালেন, ঠিক তখনই শোনা গেল মেঘের প্রথম গুরুগুরুধ্বনি? আর, অবিকল ডাঃ লোকেশ গাউরের হস্তাক্ষরে কালো মেঘের গায়ে আলোকময় অক্ষরগুলি তখনই ফুটে উঠল।

সেদিন শেষরাতে এক বড় ভয়ের স্বপ্ন দেখে ঘুম ভেঙে গেল উমেশ সামন্তর। দেখলেন, লোকেশ এসে দাঁড়িয়েছেন। সর্বাঙ্গে ঝুরু ঝুরু মাটি। দক্ষিণ বাহু সুদর্শনধারীর ভঙ্গিমায় কনুইয়ের কাছে ভাঁজ হয়ে উঠে আছে— হাতের তালুতে একটি ভারি চৌকো পাথর। লোকেশ এত বেঁটে হয়ে গেলেন কবে? এ তো চওড়া-বুক স্পর্ধিত বামন এক। কী ব্যাপার! কবর ফুঁড়ে নাকি? মাটি-লাগা চোখের পাতার মধ্যে চোখ দুটি, ওই ভাঁটার মতো জ্বলজ্বল করছে।

ঘুমের মধ্যে উমেশবাবুর একবার মনে হল মেঘের গায়ে এই টেলিফোন নাম্বার, লোকেশের প্রেতাত্মার কাজ নয় তো? নইলে, রোমান হরফে না এসে, ডাঃ গাউরের হস্তাক্ষরে দেখা দিল কী করে? তিনি স্ত্রীর নাম ধরে ডাকতে লাগলেন— সুরমা! সুরমা!

পাশেই ঘুমিয়ে আছেন স্ত্রী সুরমা। সাড়া দিলেন না। দেওয়ার কথাও নয়। কেন না, উমেশবাবুর ঘুম তখনও ভাঙেনি।

৫/হীরের নাকছাবি

যুক্তি-বুদ্ধি, বিচার ও বিশ্লেষণ, অনুমান এবং অনুসন্ধান— যে-কোনও গোয়েন্দার এটাই স্বাভাবিক বিচরণভূমি। সেখানে হালে পানি না পেয়ে, ব্যর্থ গোয়েন্দা উমেশ সামন্ত কীভাবে ধীরে ধীরে ঢুকে পড়েছিলেন যুক্তিতর্কাতীত অলৌকিক তথা অননুমেয়র জগতে, সে কথা পূর্বেই বলা হয়েছে। গ্রিক পুরাণের থিমিয়ুস একদিন এভাবেই ঢুকে পড়েছিল ল্যাবিরিনথের গোলকধাঁধায়। তারপর সেই যেদিন মেঘাশ্লিষ্ট অন্ধকার আকাশের গায়ে, খোদ লোকেশ গাউরের ফ্লুরেসেন্ট হস্তলিপিতে পর পর ফুটে উঠতে দেখলেন সেই লৌকিক নম্বরগুলো— সেই মুহূর্ত থেকে বিশ্বাস-অবিশ্বাসের বাস্তবতা আর অলীকতার সীমারেখা মুছে গিয়ে তাঁর মধ্যে যে অনির্বচনীয়, নব-বাস্তবতার পথ হল, ভাষায় তা উপস্থিত করা সত্যিই কঠিন। যুক্তি-তর্ক-বিচার-বিশ্লেষণ— তিনি দেখলেন, আসলে সব এক পাল ভেড়া। মধ্যিখানে বসে আছে এক জ্যোতির্ময় সোনালি সিংহ। গড্ডলিকা-প্রবাহ তারই বন্দনাগীতি গেয়ে চলেছে। এরপর আর তাঁর সামনে-পিছন বলে কিছু রইল না। জীবনে এত শক্তিশালী তিনি আগে কখনই বোধ করেননি।

এ-হেন বিশ্বরূপ-দর্শনের পর গাণ্ডীব তুলে নিতে গিয়ে অর্জুনের হয়ত এতটাই হালকা লেগেছিল, রিসিভার তুলে নিয়ে যখন তিনি পরদিন সকালে সেই দৈবলব্ধ নাম্বারটি নিজের টেলিফোন-যন্ত্রে ডায়াল করলেন।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

কিন্তু, হা হতোস্মি? হায় হায় এবং অহো। এত কাণ্ডের পর এ কী করে ভাবা যেতে পারে যে উত্তরে ভেসে আসে হেড দিদিমণির সেই তীক্ষ্ণ, কাটা-কাটা ভর্ৎসনা: প্লিজ চেক দা নাম্বার ইউ হ্যাভ ডায়ালড! এ কী অপ্রত্যাশিত আঘাত, হরিষে বিষাদ! বিশ্বাস-অবিশ্বাসের সীমারেখা যখন মুছে গেছে, তখন, তারও পরে, এ কি ঘোর অনুপপত্তি! ভুল হয়নি তো ডায়ালিং-এ? অবশ্যই এবং অতি অবশ্য। অতীত জীবনে অনভিজ্ঞাত এখনও অটুট এক অবিচলিত আত্মবিশ্বাসে উমেশ সামন্ত আবার ডায়াল করলেন: 6129966.

'প্লিজ চেক দা নাম্বার...'

কুট!

মাঝপথে কেটে দিলেন উমেশবাবু। এবার সত্যিই মাথা ঘুরে গেল তাঁর। টাল সামলাতে গিয়ে সহসাই মনে হল, আচ্ছা নাম্বারটা বিদেশের কোনও শহরের নয়ত। হ্যাঁ-হ্যাঁ, হতেই পারে। হতেই পারে। আর যদি তাই হয়, তাহলে কোন শহর?

যেই না ভাবা, অমনি, যার-পর-নেই এলোমেলোভাবে, প্রথমেই মনে এল ভিয়েনা, টোকিও, রোম, মিউনিখ... এরা। তারপর ভাবলেন, নিচের দিকে বুওনস আইরেস, রিও-ডি-জানেরিও থেকে গ্লোবের একেবারে ওপরে ওই আর্কটিক অঞ্চলের দিকে কোপেনহাগেন, স্টকহোম, অ্যামাস্টার্ডামের মত ঘ্যাম-ঘ্যাম শহরগুলো তো থেকে গেছে। না, এভাবে হয় না। মহাদেশ ধরে যদি ভাবি। আফ্রিকা! ওখানে তো দেশের সংখ্যাই খান-পঞ্চাশ। তাহলে, পঞ্চাশটি তো শুধু রাজধানী! তবে, এও ঠিক যে, বিদেশ ভাবনে শুরু করা উচিত নিঃসন্দেহে বাংলাদেশ দিয়ে। যেমন, ঢাকা, চিটাগং— এরা সব। ক্রমে এই সব এবং আরও নানান শহরের নরনারী যে-যার জাতীয় পোশাকে, ফ্যাশন-শোর মডেলের মতো, বিবিধ বিধুর, বিভ্রান্ত, বিনয়ী, বিদ্রোহী, বিমূঢ়, বীতস্পৃহ প্রমুখ তথা মূলত বিবস্ত্র অভিব্যক্তি-সহ লীলাময় ভঙ্গিমায় হেঁটে অলীক মঞ্চের ওপর সামনে এগিয়ে এসে ফের পিছনের অন্ধকারে মিলিয়ে যেতে লাগল। আসলে, 'উমেশবাবু ভাবলেন', 'তাঁর মনে পড়ল' এভাবে যা বলা হচ্ছিল, তা ভুল। আসলে, এই সময় যা-কিছু ভাবার উমেশবাবুর ভাবনা নিজেই ভাবছিল— এ বিষয়ে যাবতীয় দায়-দায়িত্ব থেকে তাঁকে ছুটি দিয়েই মন তার স্বাধীন কাজকর্ম চালিয়ে যাচ্ছিল। আসলে, সম্পূর্ণ উন্মাদ হতে, তখন আর, অনেকক্ষণ দেরি ছিল না উমেশবাবুর।

হঠাৎ, হঠাৎ মনে পড়ে গেল এবং ভাগ্যিস। আরে, নাম্বার তো লেখা ছিল বোম্বে-গাইড নামে পথ-নির্দেশিকার ওপর। তাহলে নাম্বারটা তো বোম্বেরই হবে। অন্তত, বোম্বের দাবিই সবার আগে। তাই নয় কি? ছি-ছি, এ-সব কী হযবরল ছেঁকে ধরেছিল। কী সব যা তা কে ভাবছিল এতক্ষণ! হ্যাঁ, এবার, এই এতক্ষণে নিজের ভাবনা আবার নিজেই ভাবতে পারছি আমি। মাথা-ফাথা খারাপ হয়ে গিয়েছিল নাকি আমার, অ্যাঁ!

বোম্বের দোকানগুলো সকাল ৯টায় খুলে যায়। 022 কোড যোগ করে আজ সকালে ফোন করেছিলেন। সৌভাগ্য যে, ফোন ধরেছিলেন খোদ মালিক ভীর রবীন্দ্রন। টিপিক্যাল কেরলের মানুষ; উচ্চশিক্ষিত, ভদ্র। কাটা হীরের মতো ঝকঝকে ইংরেজিতে কথা বললেন। উচ্চারণে কেরলিয়ান রোলিং ব্যাপারটা থেকে গেছে, তবে অনেক কম। আত্ম-পরিচয় দিয়ে উমেশ সামন্ত যা জানতে চান, জানালেন। আশাতীতভাবে কো-অপারেট করলেন ভদ্রলোক। তাঁর আইডেনটিটির

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

Price Re. 1 [one] 28 PAGES 5 10 90

WESTERN RLYS. LOCAL TRAINS TIME TABLE AT A GLANCE
CENTRAL RAILWAYS LOCAL TRAINS TIME TABLE A GLANCE
* CITY BUS ROUTES IN DETAIL
KHANNA'S — 612 99 66

BOMBAY GUIDE

প্রমাণ উমেশবাবু ফ্যাক্স করতে চান শুনে বললেন, 'মাই-মাই! কী যে বলেন! এ-ধরনের ইনভেস্টিগেশনে এক-একটা মুহূর্তের দাম কত আমি কি জানি না। আর আমি তো শুধু রেকর্ড দেখে যা ফ্যাক্ট তাই আপনাকে জানাব। তবে দেখবেন মিঃ, সাক্ষী-টাক্ষি যদি করেন তো প্লেন-ফেয়ার পাঠাবেন। বেলুড়মঠ দেখে আসব।'

নির্দেশ মতো ঠিক ৯টা ৪০-এ আবার ফোন করলেন উমেশবাবু।

'হ্যালো। মিঃ সামন্ত? হ্যাঁ, রেকর্ডে রয়েছে। কী নাম বলেছিলেন?'

'লোকেশ গাউর।'

'ইজ হি এ ডক্টরঅ বায় প্রফেসন?'

'ইয়েস প্লিজ।'

'এ এফ-আর-সি-ও-জি?'

'দ্যাটস রাইট।'

'আকাশ... আকাশ লীনা?'

'দ্যাটস দা নেম অফ দ্য হাউসিং কমপ্লেক্স।'

'টু হ্যান্ড্রেড থ্রি গড়িহাহাটা রোডা? ওয়েল দা ডক্টরঅ ডিড বাই আ ডায়ামন্ড ফ্রম দিস শপ, আ রাদার কস্টলি ওয়ান ফর ইটস্ সাইজ, আই শুড সে।'

উনি কি দিনটা বলতে পারেন। হ্যাঁ, ১৩ মার্চ, ১৯৮৮। কত দাম? ৩৫০০০ টাকা। এই ধরনের ছোট্ট হীরে কাটতে ভীষণ এক্সপার্টাইজ লাগে। নইলে অ্যাট সোর্স দাম বেশি নয়, ভীর জানান, প্লাস মেকিং চার্জ।

'মেকিং চার্জ?'

'হ্যাঁ মেকিং চার্জ। উনি ডিজাইন দেখিয়ে একটা নাকছাবি বানাতে বললেন। জুয়েলারকে দিতে হল। ...না, ভদ্রলোকের চেহারা একদম মনে নেই। তবে কথাবার্তা বেশ মনে পড়ছে। ওঁর সেদিনই ফেরার টিকিট। তাই ডেলিভারি নেননি।'

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

'নেননি?'

'না। অবশ্য চেক-পেমেন্টের ক্ষেত্রে চেক ক্যাশ না হওয়া পর্যন্ত আমরা সাধারণত ডেলিভারি দিই না। তবে এক্ষেত্রে নিশ্চয়ই সেই অভদ্রতা করতে হয়নি। কারণ, উনি নিজেই বললেন, পরে পাঠিয়ে দিতে।'

'আচ্ছা?'

'পার্সেল করতে বললেন।'

'পার্সেল করলেন?'

'ইয়া।' ভীর বললেন, 'উই সেন্ট দা থিং আফটার গেটিং ইট রেজিস্টার্ড অ্যান্ড ইনসিওর্ড অফ কোর্স। এনি মোর কোয়েশ্চেন অফিসার?'

বোম্বাই-এর বিখ্যাত হীরা-ব্যবসায়ীর অনেকখানি সময় নষ্ট করেছেন। এবার সেই মোক্ষম প্রশ্নটা করতেই হয়, যা যদি শুধু ঘ্রাণশক্তিকে মর্যাদা দেওয়ার ব্যাপার হত, তাহলে অনেক আগেই করতে পারতেন। তাই সবার শেষে। এবং এর উত্তরের সঙ্গে যেন তাঁর জীবন-মরণ সমস্যা জড়িয়ে নেই, এমন ঠাণ্ডা নিস্পৃহ গলায় উমেশবাবু জানতে চাইলেন, 'ডিড ইউ সেন্ড দা পার্সেল টু আকাশলীনা? আই মিন, টু হ্যান্ড্রেড অ্যান্ড থ্রি গড়িয়াহাটা?'

'ও, দ্যাট? ওয়েল, লেট মি চেক আপ। হাই, বীরাপ্পন?' মনে হল ইন্টারকমে বলছেন, 'উইলিউ ব্রিং দা নাইটিন এইটি এইট সেলস্ রেজিস্টার? ওক্‌কে, প্লিজ ডু ইট কুইকলি। অ্যান এক্স পুলিস অফিসার ফ্রম ক্যালকাটা ইজ অন দা লাইন।' উমেশবাবুকে বললেন, 'প্লিজ হোল্ড অন।'

ওহো, আদি-অন্তহীন অপেক্ষার সেই তিন মিনিট পাঁচ সেকেন্ডের ৯৫টি ব্যাকুল মুহূর্তের প্রত্যেকটি! সুদূর কাফ-প্যারেডের অন্ধকার ঘরে রাখা অনন্ত সময়-চুম্বকে গেঁথে যাবে বলে ৯৫টি আলপিন তখন একে একে উড়ে যাচ্ছে উমেশ সামন্ত নামে এক চেতনাহীন পিনকুশন ছিঁড়ে।

'হ্যালো।'

'ইয়েস?'

'ও, নো অফিসার।' ভীর রবীন্দ্রন সোৎসাহে বললেন, 'ইনডিড নট। অ্যান্ড ইওর হাঞ্চ ইজ অ্যাবসোলিউটলি কারেক্ট।'

'মাই হাঞ্চ?'

'ইয়া। অর অ্যাট লিস্ট', হা-হা হাসি শোনা গেল রবীন্দ্রনের। 'মাই হাঞ্চ অ্যাবাউট দ্যাট অফ ইওরস।'

'ইট ওয়জ নট সেন্ট টু গড়িয়াহাট অ্যাড্রেস?'

'নোওপ।'

'দেন, হোয়ার টু, প্লিজ।'

'অ্যাজ পার ক্লায়েন্টস ইনস্ট্রাকসনস্, দা পার্সেল ওয়জ সেন্ট টু সার্কাস রেঞ্জ, পার্ক সার্কাস, সেভেন জিরো...।'

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

স্থান-কাল-পাত্র সব ভুলে উমেশবাবু বাংলায় বলে উঠলেন, 'বাড়ির নম্বর কত? নাম কী?'

'বেগ, পার্ডন?'

'দা নাম্বার? দা প্রেমিসেস নাম্বার? অ্যান্ড দা নেম অফ দা অ্যাড্রেসি—'

'সেভেনটিন-এ বায় ওয়ান।'

'দা নেম।' নিজের অজ্ঞাতসারে এখন পুলিস অফিসারের দ্রুত-প্রশ্নের দ্ব্যর্থহীন ধমক তাঁর গলায়, 'দা নেম অফ দা অ্যাড্রেসি প্লিজ!'

'জয়ন্তী— উম—'

'জয়ন্তী— '

'বাসু-রয়।'

'থ্যাঙ্ক ইউ। থ্যাঙ্ক ইউ ভেরি মাচ। অ্যান্ড দিস', দীর্ঘদেহী সটান উমেশ সামন্ত কৃতজ্ঞতায় কুঁজো হয়ে পড়লেন, 'ইজ ইনডিড আ মিলিয়ন ডলার ইনফরমেশান!'

'এনিথিং এলস্ অফিসার?'

'নো। থ্যাঙ্ক ইউ। মাই অ্যাসিস্ট্যান্ট মে সি ইউ বিফোর লঙ।' উমেশবাবু কেটে কেটে উচ্চারণ করলেন, 'থ্যাঙ্ক ইউ এগেইন। মিঃ। ভীর। রবীন্দ্রন।'

বোম্বের লাইন কেটে উমেশবাবু সঙ্গে সঙ্গে ফোনে ডেকেছিলেন কনকলতাকে। কেস হাতে নেওয়ার পর থেকে তাঁর এমন শান্ত সমাহিত গলা কনকলতা আগে শোনেননি কখনও। এ-যেন অন্য মানুষ।

আমি যা-যা জানতে চাইছি সংক্ষেপে তার উত্তর দিন। সম্ভব হলে হ্যাঁ অথবা না বলবেন। '১৯৮৮ সালের মার্চ মাসে ডাঃ গাউর কি বোম্বে গিয়েছিলেন? ওক্‌কে। না-না, কেন গিয়েছিলেন জানতে চাই না। আপনি কি নাকছাবি ব্যবহার করেন? করেন না? আচ্ছা। আচ্ছা, মিসেস গাউর, এটা ভাল করে মনে করুন তো, আপনার চেনাজানা কেউ, কারুকে, বলেই দিচ্ছি বাঙালি মহিলা এবং পার্ক সার্কাসে থাকেন এমন কারুকে— আপনার জ্ঞাতসারে একটা নাকছাবি উপহার দেওয়ার কারণ কখনও ঘটেছিল কি? বা, বোম্বে থেকে কিনে আনার জন্যে বলতে পারেন এমন কেড— আত্মীয় বা বন্ধু, মানে ওই পার্ক সার্কাসের, — না। আচ্ছা, ঠিক আছে। পরে কথা বলব। রেখে দিচ্ছি।'

'না-না। কী ব্যাপার, একটু বলুন।' গভীর কৌতূহল ভরে জানতে চেয়েছিলেন কনকলতা।

'এখন বলব না কিছু। আপনি সন্ধের দিকে বাড়িতে থাকুন। আমি আসছি।'

এ সবই কেস হাতে নেওয়ার পর ৬ষ্ঠ মাসের সূচনার ঘটনা। অন্তর্ধান ৯.১.৯০। কেস হাতে নিলেন ২১.৫.৯২। প্রায় আড়াই বছর পরে। বোম্বেতে ফোন করলেন সেই বছরেই, ২২ নভেম্বর। বোম্বের খবরের জের হিসেবে পরে যেটুকু জানা গিয়েছিল, তা হল, হ্যাঁ, সার্কাস রেঞ্জের ওই

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ঠিকানায় জয়ন্তী ও সুব্রত বসু রায় নামে দুই পিতৃমাতৃহীন ভাইবোন ভাড়া থাকত। শুধু তারা দু'জনে। কিন্তু ৮৮ সালেই তারা বাড়ি ছেড়ে দেয়। তারপর তাদের গতিবিধি কেউ জানে না। জানা গেল, সুব্রত কাজ করত ট্রাফিক পুলিসে। সার্জেন্ট ছিল। লালবাজার যা জানাল: ১৯৯০- এর জানুয়ারি থেকে সুব্রত বসু রায়ের উপস্থিতি অনিয়মিত হতে থাকে। মার্চ থেকে সে নিরুদ্দেশ। ওই সময় সে কোথায় থাকত অফিস জানে না। সুব্রত জানায়নি। তার সঙ্গে নিরুদ্দেশ হয়েছে তার সার্ভিস রিভলভারটিও। তার নামে ওয়ারেন্ট বেরিয়েছে। পুলিস তাকে খুঁজছে।

১৯৯০-এর জানুয়ারিতে নিরুদ্দেশ হলেন ডাঃ গাউর। মার্চে ভাইবোন। সম্পর্ক একটা আছে বৈকি। দাদার রিভলভার নিজের হাতে লোড করে জয়ন্তী ভোরবেলায় গেল লেকে। তার আগে সুব্রত গোলপার্কের ফ্ল্যাটে খোঁজ করে গেছে। হ্যাঁ, যবনিকা উঠেছিল এবং অনেকখানিই। একটা কোনও গর্হিত অপরাধ করেছিলেন ডাঃ লোকেশ গাউর, ওদের প্রতি, যা ক্ষমার অযোগ্য। এমন অপরাধ, জীবন দিয়ে যার মূল্য দিতে হবে। তাই নিরুদ্দেশ ডাঃ গাউর। এ পর্যন্ত নির্ভুল। কিন্তু সুব্রত আর জয়ন্তী গেল কোথায়? কনকলতা যা বললেন, তবে কি সেটাই? এদের দু'জনের হদিস না পেলে, ডাঃ লোকেশ গাউরের সন্ধান কোনও দিনই পাওয়া যাবে না— জীবিত অথবা মৃত?

কসবার নবনির্মিত ফ্ল্যাটের দশতলার বারান্দায় সারারাত ইজিচেয়ারে পড়ে রইলেন উমেশবাবু। স্ত্রী পুত্র-পুত্রবধূ এবং নাতনি মোহিনীকে নিয়ে গেছেন কৃষ্ণনগরে। শ্যালকের বিবাহের পঁচিশ বছর উপলক্ষে। কাল সন্ধ্যাবেলা তাঁকেও যোগ দিতে হবে সেই উৎসবে।

মাঝখানে ঘুমিয়ে পড়েছিলেন। ঘুম ভাঙতে দেখলেন পূর্ব দিগন্ত জুড়ে কলকাতার আকাশ-রেখা ফুটে উঠেছে। সল্টলেকের দিকে আকাশ এখন ছানার জলের মতো ফ্যাকাশে নীল। একটুও কুয়াশা নেই, কোথাও মেঘ নেই একফোঁটা। একে একে দেখা দিচ্ছে।

৬/যবনিকা কম্পমান

কৃষ্ণনগর থেকে কাকভোরে বেরিয়েও ধর্মতলা পৌঁছতে বেলা ১১টা বেজে গেল। সুরমাদের নিয়ে গাড়ি সোজা চলে গেল কসবায়। লিন্ডসে দিয়ে অফিসের দিকে হাঁটা দিলেন উমেশবাবু। একটা গোটা দিন যোগাযোগ নেই অফিসের সঙ্গে। আমেদপুর ট্রাঙ্ক-মার্ডার কেসটা কালই সল্‌ভ করে ফেলার কথা বংশলোচনের, যদি ফিঙ্গার প্রিন্ট মিলে থাকে। ঢের খাটাখাটনি করল ছেলেটা, এই একটা কেস নিয়ে। যথেষ্ট বুদ্ধিরও পরিচয় দিয়েছে। অ্যাকাউন্ট্যান্ট ধরের সঙ্গে কথা বলে ওকে একটা স্পেশাল ইনক্রিমেন্ট দেওয়া যেতে পারে।

গ্লোব সিনেমার পিছনে ছোট ছোট গলিগুলোর একটার নাম টটি লেন। গলিতে একটাই বড়সড় বাড়ি— এলিজা ম্যানসন। জরাজীর্ণ বাড়িটিতে এককালে ছিল অ্যাংলো ইন্ডিয়ানদের বসবাস। এখন অসংখ্য ছোট অফিসের মৌচাক। তারই একটি খোপের সামনে, টপ ফ্লোরে, নিত্য ঘষামাজা হয় এমন ঝাঁ-চকচকে পিতলের ফলক: প্রাইভেট আই/ডিটেকটিভ এজেন্সি। উমেশ সামন্তর অফিস। নিউ মার্কেটের সামনে সেকেন্ড-হ্যান্ড ফিয়াটটা পার্ক করে উমেশবাবু রোজ টটি লেনের

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

অফিস পর্যন্ত হেঁটে আসেন। চারতলা পৌঁছবার আগে আজকাল তিনতলার ল্যান্ডিং-এ দাঁড়াবার সময়টা, নিজের অজান্তে, গত ৮/৯ মাসে বেশ কিছুটা বেড়ে গেছে। মলক্কা বেতের মোটা ছড়িটা এই সময় কাজে লাগে। একটানা এতটা উঠে লাঠিতে ভর রেখে হাঁপাতে হয়। রোজই ভাবেন দোতলায় থামবেন। সে আর মনে থাকে না।

রোজদিনের মতো তিনতলায় উঠে ছড়ির ওপর ভর রেখে কিছুক্ষণ দাঁড়ালেন উমেশবাবু। চারটে জিনিস এখন পরিষ্কার, তিনি ভেবে নিলেন।

১। অন্তর্ধানের সঙ্গে একটি নারীঘটিত ব্যাপার জড়িত রয়েছে আর সেই মহিলার (মেয়েটির) নাম— জয়ন্তী বসুরায়।

২। যে-কোনও কারণেই হোক মেয়েটি বেশ মহার্ঘ। অন্তত, ডাঃ গাউরের কাছে। নাকছাবির দাম সেদিকেই ইঙ্গিত করে।

৩। একটা কোনও ক্ষমার অযোগ্য অপরাধ করে ফেলেছিলেন ডাঃ গাউর। যার একমাত্র শাস্তি হতে পারে মৃত্যু। যে জন্যে তাঁকে রাতারাতি এভাবে অদৃশ্য হয়ে যেতে হয়।

৪। এতে কোনও সন্দেহ নেই যে জয়ন্তী তাঁকে খুঁজে বেড়াচ্ছে। সঙ্গে রয়েছে দাদা সুব্রত। তাদের সঙ্গে রয়েছে কলকাতা পুলিসের একটি পয়েন্ট থ্রি এইট সার্ভিস রিভলভার।

চারটি সিদ্ধান্ত। কিন্তু জিজ্ঞাসা মাত্র একটি। কী সেই অপরাধ যা ক্ষমাহীন প্রতিহিংসায় এভাবে জ্বালিয়ে দিল দুই পিঠোপিঠি ভাই-বোনকে? সার্কাস রেঞ্জের অনুসন্ধান থেকে জানা গেছে যে পিতৃমাতৃহীন ভাই-বোনের সম্পর্ক ছিল আপাতদৃষ্টিতে প্রায় প্রেমিক-প্রেমিকার মতো। রাতে তারা দরজা বন্ধ করে এক ঘরে শুত। যদিও ঘরে ডাবল বেড ছিল না।

বংশলোচন, অপারেটর-কাম-রিসেপশনিস্ট লিজা আর পিওন নরেন হাজরা— এই তিনজনকে নিয়ে উমেশবাবুর অফিস। নরেন বাইরে টুলে বসে ছিল। বসকে দেখে উঠে দাঁড়াল।

অফিসে ঢুকেই উমেশ সামন্ত জানতে চাইলেন, 'দাস কোথায়?'

'স্যার, উনি লালবাজারে।'

'ফোন করেছিল?'

'ইয়েস স্যার। বললেন, দেরি হবে।'

উঃ! তাহলে আজও হল না? ভেবেছিলেন খুনি কে, তা আজই জানা যাবে। ডি আই জি আই বি ওবেয়দুরকে আজই বলা যাবে তিনজন সাসপেক্টের মধ্যে কে অ্যারেস্ট হবে।

নিজের ঘরে বসে স্ট্যান্ডে ছড়ি আর কোট ঝোলানো প্রথম নিত্যকর্ম। তারপর চুরোট। আঃ দেশলাইটা কোথায়।

রিসিভার তুলতে যাবেন, ইন্টারকম নিজেই পিঁ-পিঁ করে বেজে উঠল।

'বলো।'

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

'স্যার, কাল থেকে মিসেস গাউর অনেকবার আপনার খোঁজ করেছেন। দশ মিনিট আগেও ফোন করেছিলেন।'

'কেন?'

'স্যার, তা তো বললেন না। কাল বিকেলে ওঁর ড্রাইভার একটা চিঠি দিয়ে গেছে।'

'পাঠিয়ে দাও।'

'স্যার, আপনার টেবিলে রাখা পেপার্স-এর একদম ওপরেই রয়েছে।'

খাম ছিঁড়ে চিঠি বের করলেন উমেশবাবু। ইংরেজিতে লেখা তিন লাইনের চিঠি। শেষের লাইনটি বেঁকে যেভাবে পাতার নিচের দিকে চলে এসেছে, বোঝা যায়, কী বিপুল উত্তেজনার মধ্যে কোনও রকমে লেখা হয়েছে এই তিনটি লাইন। তিনি দেখেছেন, সুইসাইড নোটগুলোর ক্যালিগ্রাফি এই রকম হয়। বিশেষ করে নিজের নাম সই করার সময় হাত একবার ঠকঠক করে কেঁপে ওঠেই। তারিখ নেই। পদবি লেখেননি।

প্রিয় মিঃ সামন্ত,

ফোনে পাচ্ছি না। যত ব্যস্তই থাকুন পত্রপাঠ চলে আসুন। অধীর আগ্রহে আপনার জন্যে অপেক্ষা করছি।

কনকলতা

উমেশ সামন্ত ইন্টারকমে বললেন, 'লিজা, প্লিজ গেট মি মিসেস গাউর। ইউ নো দ্য নাম্বার?'

'ইয়েস স্যার।' একটু পরে, 'মিসেস গাউর ইজ অন দ্য লাইন স্যার।'

'হ্যালো। কী ব্যাপার মিসেস গাউর?'

'আপনি এখনও ওখানে বসে?'

'আমি আসছি। কিন্তু কী হয়েছে একটু বলুন।' কণ্ঠস্বর একদম বদলে গেছে কনকলতার। এখন, এক-কথায়, ভয়ার্ত!

'ফোনে বলা যাবে না, মিঃ সামন্ত। আমার হাত কাঁপছে। রিসিভার পড়ে যাচ্ছে হাত থেকে। আপনি এখুনি চলে আসুন।'

'আর ইউ সেফ?'

'আমি জানি না। ভগীরথ ২১ জুন থেকে নিরুদ্দেশ।'

'অ্যাঁ?'

'হ্যাঁ।'

'গাড়ি?'

'গাড়ি গ্যারেজে রেখে গেছে।'

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

'পুলিসে খবর দিয়েছেন?'

'এখনও না। তবে, আমি খুব অসুস্থ হয়ে পড়েছি? আপনি না এলে—'

'ওক-এ। আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন। আমি আসছি।... লিজা?'

মিসেস গাউরের লাইন কেটে দিয়ে লিজা জানতে চাইল, 'ইয়েস স্যার?'

'আস্ক নরেন টু ফিক্স এ ট্যাক্সি ফর মি, অ্যান্ড টু ওয়েট অ্যাট গ্লোব।'

ব্রিফকেস খুলে উল্টে পাল্টে নিজের প্রিয় আগ্নেয়াস্ত্রটি একবার দেখে নিলেন উমেশবাবু। জাতে সুইডিশ। ছোট্ট আর অব্যর্থ। লুকিয়ে রাখার পক্ষে হাতের একটি তালুই যথেষ্ট। তবু, ব্যবহার হয়নি অনেকদিন। তাই, গুলি বের করলেন, দেখলেন। সেফটি খুলে, বন্ধ করলেন। তারপর হাত বাড়ালেন লাঠিটার দিকে।

দিনের বেলাতেও অন্ধকার— ভারি পর্দা টানা সেই ড্রইংরুম। ল্যাম্প-স্ট্যান্ডে আলো। আজ কনকলতা বসেছেন লম্বা সোফাটায়। পছন্দের চেয়ারটাতে বসতে যাচ্ছিলেন, কিন্তু নিজের সোফার অপরপ্রান্ত দেখিয়ে কনকলতা বললেন, 'না-না। আপনি এখানে বসুন।'

সেন্টার টেবিলের মাঝখানে জালি কাপড়ের ওপর কাগজ-সাঁটা একটা চৌকো হরিদ্রাভ, স্থূলকায় খাম। খামের গায়ে অনেকগুলো গালার সিল। দেখতে একটা রেজিস্টার্ড পার্সেলের মতো। খামের ছেঁড়া দিকটায় একগুচ্ছ ঝকঝকে, ক্রাউন সাইজ, ব্যাঙ্ক-পেপারের আভাস।

কম্পমান তর্জনী সেইদিকে তুলে ধরে কনকলতা বললেন, 'ওই যে।'

'কী ওটা?'

'একটা মস্ত চিঠি। কাল দুপুরে রেজিস্ট্রি-ডাকে এসেছে।'

'চিঠি। অত বড়? আমি তো ভাবছিলাম—'

'না-না, চিঠি। হ্যাঁ, মোট ৪০ পাতার।'

'কে পাঠাল?'

'জয়ন্তী বসুরায়।'

'কে?'

'জয়ন্তী।' মাঝখানে মুহূর্ত-দুই বিরতি রেখে কনকলতা বললেন, 'বসু রায়।'

'জয়ন্তী' হতভম্ব হওয়ার মতো ঘটনাই বটে। জীবনে কখন কী ঘটবে আগে থেকে তা সত্যিই অকল্পনীয়। জীবনভর অনুমান করে যাওয়া— আবহাওয়ার পূর্বাভাস পাওয়ার যাবতীয় প্রয়াস— সে বোধহয় শেষ পর্যন্ত এমনি এক অননুমেয়র মুখোমুখি হওয়ার জন্যই।

খামটা তুলে নিতে যাচ্ছিলেন উমেশবাবু। তার আগে জানতে চাইলেন, 'কী লিখেছে সে?'

'তা তো জানি না।'

শীত পড়েছে ঠিকই, তবে ঠকঠক করে কাঁপার মতো নিশ্চয়ই নয়। বিশেষত এই ভর দুপুরবেলায়। উমেশবাবু তো পাখা খোলার কথাই ভাবছিলেন। অন্তত এক পয়েন্টে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

'আমি বাংলা ভাল পড়তে পারি না। স্ক্রিপ্ট হলে খুবই অসুবিধে হয়।' কনকলতার দাঁতের কিটকিট শোনা গেল, সঙ্গে ঈষৎ তোতলামিও, 'প্রথম দুটো প্যারাগ্রাফ কোনও রকমে পোপ্-পড়ে আমি অসুস্থ হয়ে পড়ি। ডাক্তার যা প্রেসক্রাইব করে গেলেন তার ডাবল ডোজ খেয়েও সারারাত ঘুম হয়নি।'

চিঠির কাগজগুলো খুলে উল্টেপাল্টে দেখলেন উমেশ সামন্ত। তারপর অনুচ্চস্বরে পত্রপাঠ শুরু করলেন।

৭/ধ্বংসের মধ্য দিয়ে যাত্রা

এক

পুরোহিতের আত্মহত্যা

ঝাড়গ্রাম
জুন ২১, ১৯৯৩

মাননীয়াসু,

পত্রে আমার নমস্কার জানবেন। পত্রলেখিকাকে আপনি মোট চারবার দেখলেও নামে চেনবার কথা ছিল না। এমনকি চেহারায়ও। তবে এতদিনে গোয়েন্দা উমেশ সামন্ত নিশ্চয়ই আপনাকে আমার নাম জানিয়েছেন এবং ঠিকানা জানাতে পারেননি। এখনও উনি আমার একটা ফটোগ্রাফ পর্যন্ত জোগাড় করতে পারেননি। বেচারা উমেশবাবু।

যাই হোক, প্রথম কথাটা প্রথমেই বলে নিই। জানাই যে, বিগত তিন বছর ধরে ছবি-সহ স্পেশাল সুপারিনটেনডেন্ট অফ পুলিসের নামে কাগজে ও টিভিতে বিজ্ঞাপন দিয়ে দিয়ে, রেডিওয় ঘোষণার পর ঘোষণা করিয়ে এবং শেষ পর্যন্ত কলকাতার শ্রেষ্ঠ গোয়েন্দা উমেশ সামন্তকে কাজে লাগিয়েও যে নিরুদ্দিষ্ট স্বামীর আপনি খোঁজ পাননি— এবং তিন-তিনটি বছর ধরে প্রত্যাশায় থেকে থেকে যাঁকে অবশেষে আপনি মৃত বলে ধরে নিয়েছিলেন তবু চুড়ি ভাঙেননি তথা মঙ্গলসূত্র ছেঁড়েননি, আপনার স্বামী সেই ডাঃ লোকেশ গাউর এই মুহূর্তে বেঁচে আছেন, কিন্তু এই চিঠি যখন আপনার হাতে পৌঁছবে তখন অবশেষে তিনি সত্যিই মৃত। আগামীকাল, শনিবার ভোর রাতে আমি তাঁকে খুন করব। তার আগে আজ সারাদিন ধরে এই চিঠি আপনাকে লিখব মনস্থ করেছি। রেজিস্ট্রি ডাকে কালই পোস্ট করব।

মৃতদেহ আবিষ্কৃত হবে পরশু দিন (২৩ জুন) ভোরবেলা। যখন পাতাকুড়োনিরা জঙ্গলে ঢুকবে। তারাই দেখতে পাবে। অতএব, ম্যাডাম, অনুগ্রহ করে ২৪ জুন কলকাতার সংবাদপত্রগুলো

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

একটু ভাল করে দেখবেন। অবশ্য, ২৩ জুন সান্ধ্য আজকাল-এও বেরিয়ে যেতে পারে। আপনি যে ইংরেজি কাগজটি নেন এই ধরনের খবর তার তিনের পাতায় বা বিজ্ঞাপন না থাকলে ছয়ের পাতাতেও দেয়।

পুরোহিতের আত্মহত্যা

(আমাদের বিশেষ সংবাদদাতার কাছ থেকে)

ঝাড়গ্রাম, ২৩ জুন: ঝাড়গ্রাম-ময়ূরভঞ্জ সীমান্তে গোপীবল্লভপুর থেকে ৮০ কিলোমিটার দূরে, সুবর্ণরেখা নদীতীরে রামেশ্বর গ্রাম। এখানকার প্রাচীন জগবন্ধু মন্দিরের পুরোহিত শঙ্কর মহারাজের মৃতদেহ আজ ভোরে নিকটস্থ জঙ্গলের মধ্যে গলাকাটা অবস্থায় পাওয়া যায়। একটি রক্তাক্ত ক্ষুর মৃতদেহের পাশে পড়ে ছিল। দিনকয়েক আগে স্থানীয় নরসুন্দর মেঘনাদ পাত্রকে দিয়ে শঙ্কর মহারাজ ঝাড়গ্রাম থেকে একটি ধারালো ক্ষুর আনিয়েছিলেন বলে পুলিসসূত্রে জানা গেছে। পুলিস আত্মহত্যা বলে সন্দেহ করছে। এ-ঘটনায় এতদ্‌ঞ্চলে ব্যাপক উত্তেজনার সৃষ্টি হয়েছে।

এইরকম, এতখানি, আরও সংক্ষিপ্ত বা অধিক বিশদভাবে সংবাদটি প্রকাশিত হতে পারে। আপনার অভিজাত আন্তর্জাতিক ইংরেজি দৈনিকে এ-সব প্যাচপেচি মফস্বলি বৃত্তান্তর সঙ্গে মৃতের ছবি নিশ্চয়ই ছাপা হবে না। তবে, ছাপা হলেও, মুণ্ডিত মাথা ও শ্মশ্রুগুম্ফময়, পরনে রক্তাম্বর ও গলায় যজ্ঞোপবীত মৃত শঙ্কর মহারাজের মধ্যে আপনার স্বামী ডাঃ লোকেশ গাউরকে সনাক্ত করা আপনার পক্ষে একরকম অসম্ভবই হবে। আশা করি, এই পর্যন্ত পড়ে, আপনি সংবাদপত্র থেকে খবরটি খুঁজে বের করবেন এবং এই সুদীর্ঘ পত্রের বাকি অংশ পড়ে দেখার কারণ খুঁজে পাবেন। না, চিঠি পড়ে দেবার জন্য ভগীরথের সাহায্য আপনি আর পাবেন না। আমার দাদা সুব্রত আজ রাত থেকে আর আপনার কাছে থাকবে না। আশা করি, তিন-চারদিনের মধ্যে আপনি রেজিস্ট্রি ডাকে এই চিঠি পেয়ে যাবেন ও উমেশবাবুর সঙ্গে যোগাযোগ করবেন। মোটামুটি ২৫ কি ২৬ জুনের মধ্যে (চিঠির ডেলিভারি সময়মত হলে) পুলিস জেনে যাবে যে, আত্মহত্যার ঘটনা নয়, এটি একটি ঠাণ্ডা মাথার খুন এবং সেই হিমশীতল মস্তিষ্কধারিণীটি কে। এই শঙ্কর মহারাজ ওরফে শঙ্করানন্দ মুখোপাধ্যায় ব্যক্তিটি আসলে তিন বছর আগে নিরুদ্দিষ্ট কলকাতা মেডিকেল কলেজের অধ্যাপক তথা গায়নাকোলজি বিভাগের উপ-প্রধান ইন্দোরের ডাঃ লোকেশ গাউর ছাড়া আর কেউ নন। আশা করি, ২৫/২৬ তারিখেই, প্রকৃত তথ্য সংবাদ হয়ে ওঠার আগেই, পুলিস আপনাকে মেদিনীপুরে নিয়ে আসবে মৃতদেহ সনাক্ত করাতে। ২৬ তারিখের মধ্যে পুলিসি তৎপরতার আঁচ না পেলে, বা কাগজে প্রকৃত ঘটনা প্রকাশ না পেলে, আমি ধরে নেব, তাহলে কোনও কারণে আমার চিঠি এখনও আপনার সমীপে পৌঁছয়নি। সেক্ষেত্রে, ২৭ জুন ভোরে আমি আপনাকে ফোন করব।

আপনার এ-রকম কৌতূহল হওয়া স্বাভাবিক যে, আমি পুলিসকে না জানিয়ে কেন প্রথমে আপনার কাছে স্বীকারোক্তি করছি। স্বীকার করি, আপনার এই মুহূর্তের বিদীর্ণ মানসিক অবস্থায় এমন ব্যথিত জিজ্ঞাসা জাগা স্বাভাবিক। দেখুন, ম্যাডাম, যদি শুধু স্বীকারোক্তিই আমার উদ্দেশ্য হত তাহলে আমি নিঃসন্দেহে তাই করতাম। কিন্তু পুলিস তো চায় শুধু অপরাধীকে— অপরাধ

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বিষয়ে তাদের কোনও কৌতূহল নেই। অথচ, যে-কোনও অপরাধ— সে তো অপরাধীর একটা অংশ মাত্র। অংশের জন্য পূর্ণকে শাস্তি দিয়ে পৃথিবীর সমস্ত পুলিস, সমস্ত আইন, এমনকি পৃথিবীর সব বিচারপতি মানুষের আস্থা তো সেই কবেই হারিয়েছে।

কিন্তু ম্যাডাম, আমি চাই অপরাধীকে আপনার সামনে উপস্থিত করতে। আমি জানাতে চাই, কেন এই হত্যা (যদিও আপনার স্বামী এখনও বেঁচে আছে)। তাই এই সুদীর্ঘ পত্র-প্রতিবেদনটি আপনাকে না পাঠিয়ে আমার উপায় নেই।

—দুই—

গর্ভের ঘুমন্ত তপোবনে

আচ্ছা, প্রথমেই আপনাকে জানাই, আপনার স্বামীর নিরুদ্দিষ্ট হওয়ার কারণটা কী। কাগজে দেখেছিলাম, পুলিসকে আপনি বলেছিলেন, আপনাদের দাম্পত্য-জীবন ছিল দৃষ্টান্তস্বরূপ। আপনাদের বিবাহিত জীবনের স্বাদ, নাকি কোথাও রাখেনি কোনও খাদ? এবং স্বামীর জীবনাশঙ্কাও আপনি করেন না, কি সামাজিক কি রাজনৈতিক দিক থেকে। রাজনীতি ছিল ওঁর কাছে হিন্দুর গো বা মুসলমানের শূকর-মাংসের মতন, আপনি বলেছিলেন। পুলিসের কাছে দেওয়া আপনার জবানবন্দীর সারমর্ম এক কথায় হল: ডাঃ গাউর ছিলেন নিঃশত্রু।

তাঁর শত্রু, মর্মান্তিক দেরিতে হলেও, এখন আপনি বুঝতে পারছেন, অন্তত একজন ছিল। অধীনার করুণা গ্রহণ করুন মিসেস গাউর। শিশুর কাছে যেমন মাতৃস্তন্য, আপনাদের মতো নিরাপত্তাপায়ী সরলা গৃহবধূদের দাম্পত্য জীবনে কী-গভীর বিশ্বাস— ভাবলে অবাক হই। ওর কেনা ফ্ল্যাট আমার নামে বা জয়েন্টলি, ওর টাকাকড়ি যা, সাদা অথবা কালো— প্রকৃত প্রস্তাবে সব আমার, ব্যাঙ্কের ভল্টে গয়নাগাঁটি আমার— ড্রাঙ্ক অর আদারওয়াইজ রোজ এসে তো আমার পাশেই শোয়। দরকারে সঙ্গমও করে। আমি সতী। আমি ওর বিবাহিত স্ত্রী। অতএব, ও আমার। সতীন বলতে আমার যদি কেউ থাকে, তো সে ইনকাম ট্যাক্স। কিন্তু হায়, প্রকৃত ঘটনা ঠিক এর বিপরীত। অন্তত আপনার স্বামী ডাঃ লোকেশ গাউর, এম আর সি ও জি, লন্ডন-এর ক্ষেত্রে।

বিশেষ করে আপনাদের ক্ষেত্রে। আচ্ছা মিসেস গাউর, স্বামীর ওপর এই যে এতখানি বিশ্বাস আপনার, এর লজিকটা কী, বলতে পারেন? না, না, আমাকে নয়। আপনি নিজেকে বলতে পারেন? (লোকেশ আমাকে যা বলেছে, ধৃষ্টতা মাফ করবেন, ম্যাডাম, আপনি নাকি মনে করেন মাসে একবার কি বড়জোর দু'বার সেক্স হওয়াই যথেষ্ট— এবং তাও শহিদসুলভভাবে? সন্তানাদি তো হলই না, ইয়ে, আপনার নাকি কখনও অর্গ্যাজম হয়নি? আপনি নাকি সম্পূর্ণ নগ্ন হওয়াতেও বিশ্বাসী নন বা কার্যকালে জামাকাপড় সবটা খোলেন না? লোকেশ আমাকে বলেছিল, আপনাদের ইন্দোরের দিকে নাকি এইরকম একটা দোঁহা প্রচলিত আছে (আশা করি ভক্ত কবিরের নয়:

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

মাহিনা মে এক

সাল মে বারো

এক্কা পে এক্কা

যব বিলকুল ছোড়ো

আর, আপনার নাকি এই থিওরিতে ছিল অচলা ভক্তি ?)*

হাঃ-হাঃ-হাঃ-হাঃ। বলুন, এর পরেও হাসি পাবে না ? এ-সত্ত্বেও আপনি বিশ্বাস রাখতেন স্বামীর বিশ্বস্ততায় ? হাসি আমি থামাই কী করে, আপনিই বলুন ! ম্যাডাম, এ-ধরনের মানসিকতা খড়ের-গাদার কুকুরকে সাজে, যে, নিজে যখন খেতে পারবে না, গরুকেও খেতে দেবে না। মানুষের কি শোভা পায় ? ছিঃ। মানুষ একটা সামাজিক প্রাণী এবং একশোবার। দাম্পত্য একটা প্রধান স্তম্ভ, সেই সমাজের। তা বলে যৌনতার মূল্য ধরে দিয়ে তাকে কিনতে হবে, এ-এটা কিন্তু খাল কেটে কুমিরকে ডেকে আনা। আর আপনি সেই ভুলটাই করেছেন।

আশা করি এখনও বুঝতে পারেননি, আমি কী বলতে যাচ্ছি। সত্যি করুণা হয় আপনাদের মতো স্বাধিকারপ্রমত্তাদের জন্য— হ্যাঁ, স্রেফ পিটি— আপনি বিশ্বাস করুন। তাহলে শুনুন, এবং শুনে যদি আকাশ ভেঙে পড়ে আপনার মাথায় তো পড়ুক যে, এই অবিবাহিতা পঞ্চবিংশতিবর্ষীয়া পত্রলেখিকা মাত্র উনিশ বছর বয়সে আপনার তৎকালীন অনূর্ধ্ব চল্লিশ স্বামীর সন্তান গর্ভে ধারণ করেছে (যা আপনি ৩৫ বছরেও পারেননি)— যদিও সে অঙ্কুর-হত্যায় প্রধান সহযোগী ছিল ফিটাসের বিবাহিত-বাবা ! দেখতে দেখতে চারমাসে পড়ে গিয়েছিল এবং প্লাসেন্টা ফর্ম করে গিয়েছিল। তাই অতখানি অগ্রসর অবস্থায় গর্ভপাত কতখানি বিপজ্জনক হতে পারে জানার জন্য আলট্রা সোনোগ্রাফ করা হয়, আর তাই জানা গিয়েছিল, তারা ছিল মাতৃগর্ভের নিশ্চিন্ত তপোবনে ঘুমন্ত দুই যমজ ভাই। আমি যদি আবোর্ট করাতে রাজি না হতাম, তাহলে তখনই তো আপনার নটেগাছটি মুড়োত, তাই নয় কি, মিসেস গাউর ? তাহলে তো, জোড়া প্যারামবুলেটর ঠেলে আমি এখন লেকে বেড়াচ্ছি, আর আকাশলীনার চারতলার ছাদ থেকে আপনি সেই দৃশ্য উপভোগ করছেন ! আপনার চোখে বায়নাকুলার।

তাই বলছিলাম, লোকেশের ফ্ল্যাট, টাকাকড়ি এসব আপনার হতে পারে, কিন্তু লোকেশ 'ছিল' আমার। সত্যি কথা বলতে কি ওগুলি ছিল (ওই সব ফ্ল্যাট-ট্যাট) মানুষের আবহমান যৌনতার সম্মানে, আপনাকে দেওয়া আমাদের অনুকম্পাভরা উপহার মাত্র। ভিক্ষা ভাবলেও ভাবতে পারেন।

ম্যাডাম, আমি ওপরে লিখেছি, লোকেশ 'ছিল' আমার। দোষ ধরবেন না ওই ক্রিয়াপদের; যেহেতু আমি আগেই জানিয়েছি এই চিঠি লেখার সময় পর্যন্ত সে বেঁচে আছে, গ্র্যামাটিকাল এরর মনে করবেন না যেন।

আসলে, সে তো থেকেও নেই। কেননা, মৃত্যুর আগেই আমি তাকে মেরে রেখেছি। এই চিঠি আপনি যখন পাবেন, তার বেশ ক'দিন আগেই, ২২ জুন ভোররাত্রির পর সে তো আর থাকবে না। আমার কাছে তাই এই মুহূর্তেই সে মৃত।

ভবিষ্যৎ এখন বর্তমান, আমার কাছে, বর্তমান অতীত। তাই ওই ক্রিয়া-বিপর্যয়।

---

* উল্লেখ থাকে যে ব্র্যাকেট-বন্ধ অংশটি উমেশবাবু পাঠ করেননি।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

—তিন—

'মেয়েটা কে গো?'

পত্রলেখিকাকে আপনি মোট চারবার দেখেছেন। প্রথমবার দেখেন ১৯৮৪ সালের ১০ সেপ্টেম্বর। তখন সন্ধেবেলা। আপনাদের স্প্যাসটিক সোসায়েটির আন্তর্জাতিক সেমিনার হচ্ছিল তখন কলকাতায়, ঝেঁটিয়ে সাহেব-মেম এসেছে, নিঃশ্বাস ফেলার ফুরসত নেই আপনার। সে-রাতের ডিনারে লোকেশেরও যোগ দেওয়ার কথা। আসন্ন ভিয়েনা কনফারেন্সে আপনার আমন্ত্রণ নিশ্চিত করার জন্যে সুইজারল্যান্ডের প্রতিনিধি ডাঃ লেভিকে একটা সোনার চামচ উপহার দেবেন আপনি আপনার সোসায়েটির পক্ষে, (ওটা আগের দিন আমার পছন্দ অনুযায়ী কেনে লোকেশ)— আর সেটা ভুলে গেছেন সঙ্গে নিয়ে যেতে। ফোনে বার বার না পেয়ে আপনি সোজা চলে আসেন আপনাদের তৎকালীন মহেন্দ্র রোডের বাসায়, ও বেল দিয়ে ফ্ল্যাটে ঢুকেই একি 'তুমি এখনও চেম্বারে যাওনি' বলে ভেতরে ঢুকে যেতে যেতে এবং দ্রুত বেরিয়ে যাওয়ার সময় অপাঙ্গদৃষ্টিপাতে আপনাদের বাইরের ঘরের সোফায় যে ছোটখাটো, জড়সড় কিন্তু স্বাস্থ্যবতী (আপনার স্বামীর মত, 'স্বাস্থ্যই সৌন্দর্য'— বিশেষত মেয়েদের ক্ষেত্রে)— যে মেয়েটিকে দেখেছিলেন, আমিই সে। অবশ্য, দুই পলকের সেই দু'বার দেখা, আমাকে সম্পূর্ণ ভুলে যাওয়াই স্বাভাবিক। তবে এখন ঘটনাটি মনে পড়ছে আশা করি? অবশ্য, ততক্ষণে আমাদের শোবার ব্যাপার একবার হয়ে গেছে, কেননা, পূর্ব ব্যবস্থামত আপনি বেরিয়ে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে ও ফোন করেছিল আমায় এবং আধঘণ্টার মধ্যেই আমি ওখানে। (সত্যি কথা বলতে কি আমাদের পেতেন না, কিন্তু বেরোবার মুখে লোকেশ আমাকে বুকে জড়িয়ে ধরে যখন চুমু খেল এবং শুধু ও নয়, যার-পর-নেই অকথিতভাবে আমিও ফিল করলাম 'আর একবার'— তাই থেকে গেলাম।)* সেই প্রথম দিন, বেডরুমে নিয়ে যায়নি, যা হওয়ার সোফাতেই হয়েছিল। হেন সময় বেল বাজল। আপনি বলতে পারেন, হোয়াই, ইন, সো মাচ ডিটেলস! না-না, অশ্লীলতা করা আমার উদ্দেশ্য নয়। এখানে, আপনি ভেবে নিন, খড়ের গাদার কুকুরের সঙ্গে আর্গুমেন্ট করছে হকদার গরু।

যাই হোক, এহ বাহ্য। বেঙ্গল ক্লাবে সেদিন রাতের পার্টিতে স্বামীর কাছ থেকে আমার ও-হেন উপস্থিতির জন্য 'মেয়েটা কে গো' বা 'কী জন্যে এসেছিল' ধরনের একটা কৈফিয়ত নিয়ে নিলেই হবে এবং তা গ্রহণযোগ্য হোক হতেও বাধ্য, এ-রকম অর্বাচীন আত্মবিশ্বাসে সোনা-চামচের বাক্স হাতে, 'আটটার আগেই যাবে কিন্তু, ডিনার ঠিক ন'টায়' এই বলে আপনি ঝড়ের বেগে বেরিয়ে গেলেন, তাই লক্ষ্য করেননি, বা, নইলে দেখতে পেতেন যে, টেলিফোনের রিসিভারটা নামানো ছিল আর সেই দুপুর থেকেই।

অতঃপর আপনাদের পূর্বতন মহেন্দ্র রোডের ফ্ল্যাটে এবং অধুনা আকাশলীনাতেও আমি কয়েকবার গেছি। বহা বাহুল্য, আপনি যখন নেই। ইউনেস্কোকে ধন্যবাদ। মূক-বধির ও বিকলাঙ্গদের

---

* উল্লেখ থাকে যে ব্র্যাকেট-বন্ধ অংশটি উমেশবাবু পাঠ করেননি।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

নিয়ে আপনার উদয়াস্ত ব্যস্ততাই আপনার নামের ফ্ল্যাটে আমার অবিরত যাতায়াতকে অর্গল করে দিয়েছে। ঘটি-বাটি চুরি যাওয়ার ভয়ে বাড়িতে রাতদিনের কাজের লোক নেই অথচ স্বামী খোয়া গেছে তার খবরই রাখে না, এমন গৃহিণীকে করুণা ছাড়া আর কী করা যায়, আপনিই বলুন তো মিসেস গাউর! অবশ্য, মাঝে মাঝে যখন মনে হয়, ওহোঃ কী গভীর বিশ্বাস ছিল আপনার, আপনার স্বামীর বিশ্বস্ততায়, তখন একটু দুঃখুও হয় আপনার জন্যে, জানেন! তবে, আকাশলীনায় খুব একটা যেতে হয়নি আমায়। কারণ, ততদিনে জোকার কাছে একটা রিসর্টে মাসভাড়ায় একটা ঘর বুক করেছে লোকেশ। যখন ইচ্ছে তুলে নিয়ে যেত। যেখানেই আমি থাকি।

মহেন্দ্র রোডেই গেছি বেশিবার। আপনাদের প্রত্যেকটি বেডস্প্রেডের ওপর আমি শুয়েছি। জামাকাপড়ের সঙ্গে যাবতীয় লজ্জা মেঝেয় খুলে রেখেই, বলা বাহুল্য। লোকেশ বলত, শুধু নগ্ন হওয়াই যথেষ্ট নয়। মেয়ে মানুষের সার্থকতা তার অপর ভূষণ লজ্জাও খুলে রেখে নগ্নতর হওয়ায়। অন্যত্র, তারা যেখানে সফল হয়েছে হোক, উত্তরোত্তর শ্রীবৃদ্ধি হোক তাদের, শুধু সেই সব মেয়েরা যেন বিছানায় না আসে। আর আপনি কিনা, জামাকাপড়ই খুলতেন না সবগুলো? মাফ করবেন, এখানে আমি লেখা থামিয়ে ফের একচোট হেসে নিচ্ছি। আপনি যাই বলুন ম্যাডাম, আমি কিন্তু লোকেশের এই সব ভিরেইল, ও নাগরিক সুশিক্ষিত কথাবার্তা বরাবর খুবই পছন্দ করি। জানি আপনি তার এ মাতৃভাষার সঙ্গে অপরিচিত, কেন না, আপনার সঙ্গে তো কথা বলত, মৈথিলি বুলিতে, যাতে নাকি বিস্তর ভাল-ভাল ভজন লেখা হয়েছে। লোকেশ আমাকে বলত, বেশি দূর যেতে হবে না, রাস্তার কুকুর-কুকুরি, বাড়ির হুলো আর মেনি, এদের আচরণ লক্ষ্য কর। হই না মানুষ, অর্গানিজম তো একই। সামাজিক ঢাকনাটা খুলে ফেল। দেখবে, এই জিনিস। (তখন যা নিয়ে ব্যস্ত) অবিকল এই জিনিস। এ-ভাবেই সে বন্দনা গাইত আমার শরীরের। গানই মনে হত আমার। সে তার ভাষা যতই অসামাজিক হোক না কেন। আমি আর লোকেশ কিন্তু, ফর ইওর ইনফর্মেশান, আমরা কিন্তু, ছোট ছোট হাউস-ট্রি দিয়ে সাজানো, দেওয়ালের রঙিন মোজেইক-টাইলে মাঝে মাঝে সুন্দর ছবিগুলো (অর্ফিউসের ছবিটা খুব টানত, মুখে বাঁশি)— এ-সবের মাঝখানে শাওয়ার খুলে জড়াজড়ি দাঁড়িয়ে থেকেছি। সে আদ্যোপান্ত সাবান মাখিয়ে দিয়েছে আমাকে। মিথ্যা কথা বলব না: আমার একটুও খারাপ লাগেনি। নষ্ট, পারভার্ট যা ভাবতে চান ভেবে নিন আপনি। গান মনে হয়েছে? হ্যাঁ, গানই মনে হয়েছে।

বিশেষত, বাড়িতে বিছানা-ব্যবহারের আগে লোকেশ প্রত্যেকবার একই কথা বলত আমাকে। যে, কোথায় কী জিনিস কী-ভাবে রেখে গেছে, ভাল করে দেখে নাও। ওই যে শাড়িটা দেখছ, যেমন এলোমেলো ভাবে রেখে গেছে, আবার সে-ভাবেই রেখে দেবে। গোছাতে যেও না যেন আবার। ভুলে পাট করে রেখো না। ঘর ছাড়ার আগে তন্নতন্ন করে দেখা হত (আমিই দেখতাম), আমার দরুন কোথাও কিছু পড়ে রইল কি না। একটা হেয়ারপিন কি ব্লাউজের একটা ছেঁড়া বোতাম। দ্বিতীয় প্রমাণটি থেকে যাওয়ার সম্ভাবনাই ছিল প্রবল। বিশেষত ব্রেসিয়ার খোলার সময় একটুও ধৈর্য যদি রাখতে পারবে! টেনে খুলে নিত। যে-জন্যে বিছানায় একদিন সেই ছোট্ট হুকটা আপনি দেখতে পান। 'ও সব হুক-ফুকের আমি কী জানি', জিজ্ঞাসাবাদের উত্তরে লোকেশ বলেছিল আপনাকে। পরে আপনার ওয়াড্রোব খুলে, একটি নয়, দুটি ব্রেসিয়ারের হুক সে ছিঁড়ে রাখে। এবং

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ব্যবহার করতে গিয়ে তা লক্ষ্য করে, স্বামী গরবে আপনার বুক ঠিক কতখানি ফুলে উঠেছিল সে আপনিই বলতে পারবেন।

হ্যাঁ, খুনই। ঠিক যেভাবে সার্থক খুনিরা বেরিয়ে যায় খুন করে। প্রমাণ না রেখে। ব্যাপারটার তাই সেখানেই ইতি হয় যদিও। বা, ঠিক ওইখানে নয়। বোধহয় তখন, সেদিন সন্ধ্যায় অ্যাস্টর-এর ফোয়ারার ধারে বাগানে চিকেন টেংরি কাবাবের সঙ্গে ও যখন সিভাস রিগাল খেতে খেতে ওই হুক-ছেঁড়ার গল্প আমাকে বলল, আর আমি একটুখানি জিন লাইমে স্টিক দিয়ে বরফ নাড়াতে নাড়াতে চাপা গলায়, হাসতে হাসতে লোকেশকে বললাম, 'আমি যদি খুন করি কখনও', প্লেট থেকে তোলা ছুরি দেখিয়ে, 'তোমাকে, তারও কোনও প্রমাণ থাকবে না।'

আপনাকে এত সাত-সতের সবিস্তারে জানাবার উদ্দেশ্য কী? উদ্দেশ্য একটাই। আমার আইডেনটি প্রতিষ্ঠা করা। আশা করি, এতক্ষণে নিঃসন্দেহ হয়েছেন। আপনারা বাথরুম তো 'ডাভ' সাবান রাখেন, তাই না? সাদাটা।

—চার—

'তুমি কে'

আপনার স্বামী নিরুদ্দিষ্ট হয়েছিলেন কেন, আপনি জানেন না। কিন্তু আমি তা জানি। আসুন, এবার সেই প্রসঙ্গে আসা যাক।

আমার স্বামী সোমনাথ আত্মহত্যা করে ১৯৯০ সালের ২ জানুয়ারি। আপনার স্বামীর অন্তর্ধানের ঠিক ৭ দিন আগে।

সোমনাথের আত্মহত্যার বিস্তৃত বিবরণে আমি যাব না। জানাতে চাই না। জানাতে পারবও না। কলমের কালি শুকিয়ে যাবে, তাহলে! তবে লোকেশের নিরুদ্দেশ হওয়ার সঙ্গে এর যেটুকু সম্পর্ক, তা তো বলতেই হবে। আর, শুধু সে-টুকুই প্রাসঙ্গিক।

সোম আত্মহত্যা করেছিল, শেষরাতে বাথরুমে ঢুকে। তার আগে সে রান্নাঘরে ঢুকে জল গরম করেছিল, রিস্ট কেটে হাত ডুবিয়ে রেখেছিল জলে। না, বাথরুমের দরজায় সে ছিটকিনি দেয়নি।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ভোরে জগিং করতে যেত ম্যাডক্স স্কোয়ারে। আমি ঘুম থেকে উঠে ভেবেছি তাই। বাথরুমের দরজা ঠেলে হঠাৎ... যাক, সে-কথা।

আমার দাদা ট্র্যাফিকের সার্জেন্ট। খুব একটা কিছু ঝামেলা হল না। সুইসাইড নোটও ছিল, যেমন থাকে: কেউ দায়ী নয়। তবু, পোস্টমর্টেম হল। মর্গ থেকে বডি পেতে পরদিন বিকেল। দাদাকে সব কথা বলি দিন-দুই পরে। লোকেশের ব্যাপারটা খুব ভাসা-ভাসা জানত। এখন সব বলতে হল। দাদা সেদিনই গিয়েছিল আকাশলীনায়। লোকেশের খোঁজে।

৮ জানুয়ারি সন্ধেবেলা আমি চেম্বারে ফোন করলাম। পেলামও। বললাম, আসছি। ও যেন থাকে। দাদার সার্ভিস রিভলভার থাকে আলমারির ভল্টে। ছুটি নিয়েছে, কিন্তু বাড়িতে ছিল না। খুলে দেখলাম, লোড করা রয়েছে। আমি রিভলভার চালাতে জানি। চাঁদিপুরের নির্জন সৈকতে দাদা শিখিয়ে দিয়েছিল। টার্গেট ছিল উদয়-সূর্য।

চেম্বারে লোকেশ নেই। বুঝলাম, কাগজে খবরটা পড়েছে। পরদিন ভোরে লেকে দেখতে পেয়েছিলাম। ও-ও পেয়েছিল দেখতে আমাকে। সেদিনের ঘন কুয়াশার মধ্যে কোথায় যে পালিয়ে গেল। আকাশলীনায় গেলাম। বললেন চেম্বার থেকে ফোন করেছিল। চেম্বারে গেলাম; সেই ল্যান্সডাউনে। ট্যাক্সি তো আর ছাড়িনি। ড্রাইভার ছোট্টু গাড়িতে বসে। কিন্তু পাখি পালিয়েছে। তারপর... গত তিন বছরে মাত্র একবার দূর থেকে তাকে দেখি। তিন সমুদ্র যেখানে মিলেছে, সেই অন্ধকার মোহানায়। রাত্রি এসে যখন মেশে দিনের পারাবারে— আছে না একটা গান? জানেন না? ওমা, সবচেয়ে প্রিয় গান ছিল লোকেশের। ঋতুর রেকর্ড আছে। লোকেশ বাংলা গান সুন্দর গাইতে পারত এবং উচ্চারণে ভুল বাঙালির চেয়ে বেশি হত না, বোধকরি তাও জানেন না! তখন আমার হ্যান্ডব্যাগে রিভলভারটি ছিল, যখন আমি লেক থেকে ফ্ল্যাটে এবং ফ্ল্যাট থেকে চেম্বারে যাই। অবশ্য সে আপনি জানবেনই বা কী করে। কিছু নদী আছে, যাতে জোয়ারভাটা খেলে না। কিছু মুখ আছে, যাতে অভিব্যক্তি হয় না। সমস্ত খুনির মুখ সে-রকম।

সেই তৃতীয়বার আপনার সঙ্গে দেখা। তৃতীয়বারই বলব, কেন না, মহেন্দ্র রোডের ফ্ল্যাটে প্রথম দিনেই তো আপনি আমাকে দু'বার দেখেছিলেন। ঢোকা এবং বেরোবার সময়। তবে প্রথম আপনি আমাকে খুঁটিয়ে দেখার সুযোগ পেলেন চতুর্থবারে। যখন চেম্বার থেকে ফের আপনার কাছে গেলাম। এবং অনেকক্ষণ ধরে। ভেতরে ডেকে নিয়ে গেলেন। জানতে চাইলেন, আমি কে এবং কেন এসেছি। আমি বললাম, আমার দিদি ওঁর পেশেন্ট এবং আমাদের এমারজেন্সি। আমার সামনেই আপনি নার্সিংহোমে ফোন করলেন। যায়নি। আমি বসে থাকলাম। আপনাদের তৎকালীন ভৃত্য নাগেশ্বর চা করে আনল। আধঘণ্টা পরে ফের ফোন করলেন। নেই। নার্সিংহোম, এবার জানাল, একটা ইউটেরিয়ান টিউমার, কার্সিনোমা, ওঁরই পেশেন্ট, এখন সে অপারেশন থিয়েটারে। কিন্তু ডাঃ গাউর এখনও এসে পৌঁছননি।

'কোথায় গেল বল তো?' আপনি আমার কাছেই জানতে চাইলেন। অন্তত, আমার দিকে চেয়ে। যদিও একেবারে মনহীন আর শূন্য ছিল আপনার চাহনি।

যা বোঝার আমি কিন্তু ততক্ষণে বুঝে গেছি। লোকেশ টের পেয়েছে আমি তাকে খুঁজছি। এবং কেন। দাদার সার্ভিস রিভলভারের অস্তিত্বের কথা তার অজানা নয়। আমি বেশ বুঝতে পেরেছি লোকেশ পালাচ্ছে এবং আমার কাছ থেকে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

পরদিন সকালে যখন ফোন করলাম, আপনি তখন সন্তোষী মা-র ঘরে। নাগেশ্বর উত্তেজিত গলায় বলল, সাহেব কাল রাতে ফেরেননি। থানায় খবর দেওয়া হয়েছে। সর্বত্র খোঁজ চলছে। মা'জি বলেছেন, অন্য ডাক্তার ডাকতে।

তারপর গত তিন বছরের কথা তো আপনার জানা। মানে, আপনার দিকটা। নিরুদ্দেশ কলমে বিজ্ঞাপনের পর বিজ্ঞাপন, ডাঃ লোকেশ গাউর এম আর সি ও পি-র ছবি-সহ। কলকাতার কাগজে কলামের পর কলাম। পুলিসকে ধিক্কার। ভারতবর্ষের সমস্ত টিভি কেন্দ্র থেকে নিরুদ্দিষ্টের ছবি। একদম প্রাইম টাইমে। সমস্ত থানায় ছবি। এমনকি বিদেশেও খোঁজখবর। বিশেষ করে লন্ডনে। যেখানে সে দু'বছর ছিল। (আমিও খোঁজ নিয়েছি সেখানে।) কিন্তু ডাক্তারকে কোথাও পাওয়া গেল না। চাঁদের ওপিঠের কথা কিন্তু কেউ জানে না, এখনও। না পুলিস, না আপনি, না উমেশবাবু। পত্রদ্বারা এই সুচতুর কীর্তিমান গোয়েন্দাটিকেও আমি সমবেদনা জানাই। পর্বতের দৌড় তো ওই ডায়মন্ড কর্নার ইনফরমেশানের মূষিক প্রসব পর্যন্ত। তাও যদি একটুও কৃতিত্ব থাকত নিজের। ম্যাডাম, আপনি কি খবর রাখেন, টানা ছ'মাস ধরে মাথা খুঁড়ে একটিও ক্লু না বের করতে পেরে উনি শেষের দিকে জানবাড়ি যাচ্ছিলেন। উনি অনন্তবাহু ও শশিসূর্যনেত্রম কৃষ্ণের কাছে বিশ্বরূপ দেখাবার আবেদন করেছিলেন— যদি তার মধ্যে আমাকে খুঁজে পান! কাছা-খোলা বিরহী যক্ষের মতো 'মেঘদূত' থেকে মেঘস্তোত্র উচ্চারণ করে উনি যখন মেঘের গায়ে ফুটে উঠতে দেখেছিলেন ফোন-নাম্বারটা, তখন তো বদ্ধ উন্মাদ। বিখ্যাত মনস্তাত্ত্বিক ডাঃ ধীরেন গাঙ্গুলি বললেন, না-না, নাম্বারটা আপনি আগেই কোথাও দেখেছিলেন। ভাল করে মনে করুন তো। তখন মনে পড়ে বোম্বে গাইডের কথা। তবে ভারসাম্য ফিরে পান। ওঁর অফিসের পিওন নরেন হাজরার কাছে শুনে দাদা (ভগীরথ) আমাকে এ-সব টেলিফোনে জানায়। শুনে তো হেসেই খুন আমি। সত্যি, বৃদ্ধ ক্লাউন একটি!

—পাঁচ—

এই পথ যদি না শেষ হয়...

সোমনাথের সঙ্গে আমার পরিচয় হয় ৮৮-র শেষ দিকে। মাল্টিন্যাশনাল লাইফল্যাব কোম্পানির সুদর্শন এই মেডিকেল প্রতিনিধির সঙ্গে লোকেশই আলাপ করিয়ে দিয়েছিল। সোমনাথের ব্যাপারে আমি আগেই বলেছি আপনাকে, আমার বিশেষ কিছু বলার নেই। শুধু এই যে, আমাদের সমান্তরাল মেলামেশা লোকেশের কাছে কোনও গোপন ব্যাপার ছিল না। বরং এটা ঘটেছিল আগাগোড়া তার জ্ঞাতসারে, তার অভিপ্রায় অনুযায়ী বা এমনকি, তারই অভিভাবকত্বে। এর রূপরেখা অনেকখানিই লোকেশের নিজের হাতে তৈরি।

শুরুতে ওর সঙ্গে প্রেমের অভিনয়ই করতাম আমি। কিছু কিছু প্রশ্রয়ও দিতাম। প্রশ্রয় বলতে, কথাবার্তায় যেটুকু। যেমন মাস-ছয়েকের মাথায় ও যখন বলল, 'বাড়িতে মেয়ের ছবি দেখাচ্ছে, কী বলব?' আমি বললাম, 'কী বলবে সে তুমিই জানো!' এই ধরনের কথা বলার সময় যুবতী

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

মেয়েদের চোখে একটু কটাক্ষ এসে যায়ই। প্রশ্রয় বলতে ওইটুকু। এই দেখুন, ওর কথা এসে যাচ্ছে। কিন্তু ওর কথা তো আমি আপনাকে বলব না কিছু। ও তো এই কাহিনীতে অপ্রাসঙ্গিক। শ্যামার উত্তীয়। অপ্রাসঙ্গিক নয়? উত্তীয়র ব্যাপারটা আপনি জানেন না, না? লোকেশ জানে। ইন পয়েন্ট অফ ফ্যাক্টি, ও তো আর জি করে পড়ার সময় অ্যানুয়াল ফাংশনে উত্তীয় করেছিল বলে আমাকে বলেছিল। তবে একদিন খুব পাগলামি করেছিল লোকেশ। সেই যেদিন আমাকে আর ওকে (আঃ আমি কেন যে নাম করতে পারছি না ওর!) প্রথম যুগলে রাস্তায় দেখল।

'কাল দেখলাম তোমাকে।'

'কোথায়?'

'আর সোমনাথকে।'

'অ্যাঁ!'

'হ্যাঁ। তখন তোমরা ব্রেবোর্ন রোডে। ব্যাঙ্ক অফ টোকিওর একদম সামনে।'

'অমনি তুমি ছোট্টু সিংকে বললে, এই রোককে!'

'তুমি একটা ধবধবে সাদা শাড়ি পরেছ দেখেই আমি অবাক হলাম সবচেয়ে বেশি। পাড়ে নীল নকশা।'

'ওম্মা! এ-সব পাড়-ফাড় তুমি কবে থেকে লক্ষ্য করছ? না-না... সাদা শাড়ি পরলে কী হয় জানো, মুখটা বেশি করে চোখে পড়ে।'

'সাদা শাড়ি পরে তুমি একদিনও আমার কাছে আসনি।'

'তুমি কি আমার মুখটুকুতেই ইন্টারেস্টেড ছিলে নাকি, জানি না তো। চুপ করে আছ কেন। না-না, আমি অভিযোগ করিনি। তা... তারপর?'

'কী তারপর?'

'ওই যে। দেখতে পেলে আমাদের। তারপর কী করলে বলো।'

'তারপর আর কী। ফলো করলাম তোমাদের।'

'গাড়ি?'

'গ্র্যান্ডের সামনে পার্ক করতে বললাম ছোট্টুকে।'

'আচ্ছা! তারপর?'

'তারপর থেকে তুমিই বাকিটা বলো না। আমি তো শুধু ফলো করেছি। সাইলেন্ট পিকচার। তুমি বললে ডায়ালগ আসবে।'

'না-না, তুমিই বলো। যা দেখছ তাই বলো।'

'আর-এ! এ তো সেই সপ্তপদীর মোটর গাড়ির সিকোয়েন্স হয়ে যাচ্ছে।'

'বলবে না তো?'

'মাঝে-মাঝে দাঁড়িয়ে পড়ছিলে কেন তোমরা!'

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

'আমরা কোথায় যাব আর কতদূর পর্যন্ত যাব, সেই নিয়ে মতে মিল হচ্ছিল না।'

'ডিসিশান নিলে তাহলে ওই কার্জন পার্কের শেষে রানী রাসমণি রোডের মুখে এসে?'

'হ্যাঁ। সোমনাথ বলল—'

'তোমরা তো বেশ গটগট করে পেরিয়ে গেলে রাস্তাটা। এদিকে আমি বেশ খানিকটা দূরত্ব রেখে হাঁটছিলাম। তার ওপর অফিস-ছুটির ভিড়। পিছিয়েই পড়ছিলাম। তোমরাও রাস্তা পেরলে আর পুলিসও ট্র্যাফিক দিলে ছেড়ে।'

'তারপর? আমার গল্পটি ফুরুলো!'

'না-না। ফুরলো কোথায়। তাহলে তো ভালই হত। আর খুঁজে পেতাম না তোমাদের। আজকাল তো সাড়ে পাঁচটায় সন্ধে।'

'তাহলে?'

'আসলে আমি তো জানিই না যে ট্র্যাফিক ছেড়েছে। জানলাম রাস্তায় নেমে।

'তারপর?'

'তারপর আর কী। তোমাদের একবার দেখতে পাচ্ছি, একবার হারিয়ে যাচ্ছ। এই অবস্থায় আমি ওদিকে দৌড়ে যাচ্ছি আর গাড়ির পর গাড়ি ব্রেক কষছে, ক্যাঁচ-কোঁচ। ক্যাঁচ-কোঁচ।'

'পাগল নাকি তুমি।'

'আরে শোনই না। একটা জিপের মাডগার্ড তো একটু পুশ করেই... ছড়ে গেছে এখানটা। যাই হোক ও-ফুটপাথে যেতে যেতে তোমাদের শেষবার দেখতে পাই নেতাজি স্ট্যাচুর নিচে। কিন্তু, ওখানে গিয়ে আর ট্রেস করতে পারলাম না। সামনে মোহনবাগান মাঠ পর্যন্ত অন্ধকার।'

'শেষ?'

'না। ভাগ্যিস আকাশবাণীর পেভমেন্টে তোমাদের ফের মতান্তর। তাই ওখানে পেলাম। তারপর থেকে ইডেন ধরে সেই গোয়ালিয়র মনুমেন্ট পর্যন্ত একবারও চোখের আড়াল হতে দিইনি। এরপর আর তারপর বলো না যেন।'

'কেন?'

'বাঃ। এবার তো তুমি বলবে। তারপর তো নৌকায় উঠলে তোমরা। আমি শুধু ডাঙায় দাঁড়িয়ে দেখলাম নৌকাটা একটা নোঙর-করা জাহাজের নিচে গিয়ে দাঁড়াল। তখন তো নৌকাটাই দেখা যায় না। যা অন্ধকার।'

'কিছু করিনি আমরা, বিশ্বাস করো।'

'কিছু বললে?'

'না, মানে গান গাইতে বলল, তাও গাইনি।'

'ছ'-মাস হয়ে গেল। আর কবে গাইবে?'

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

'কেমন দেখলে বলো সোমনাথকে, আই মিন আমাদের দু'জনকে, তাই বলো। মানাবে?'

'দেখলাম ও তোমার তুলনায় বেশ লম্বা।'

'সে তো সবাই লম্বা। তুমি তো আরও।'

'দেখলাম, পাশাপাশি, কিন্তু ও তোমার দিকে একবারও ফিরে তাকাল না।'

'সে তো রাস্তায় বলে। তাই।'

'সামনের দিকে তাকিয়ে হেঁটে গেল আগাগোড়া। যেন সঙ্গে কেউ নেই। একা হাঁটছে। আর দেখলাম—'

'আর কী দেখলে?'

'দেখলাম, নৌকোয় তুমি আগে উঠলে। মাঝির হাত ধরে সোমনাথ উঠল তারপর।'

'কিছুতেই উঠবে না জানো', কুলকুল করে হাসতে হাসতে জয়ন্তী বলল, 'বলে, সাঁতার জানি না।'

—ছয়—

দেহ ও দেহাতীত

'৮৮-র অক্টোবরে আমার আর সোমনাথের বিয়ে হল খুব ঘটা করে। রেজিস্ট্রেশানের পরে সেন্ট পলস ক্যাথেড্রালের প্যারিস হলে নিমন্ত্রিতের সংখ্যা পাঁচশো ছুঁয়েছিল। পার্টি অবশ্য একটাই— দু'পক্ষের একসঙ্গে। তবে, আমাদের যে এত আত্মীয়স্বজন বা বন্ধুবান্ধব আছে তা আমরাই জানতাম না। আমি তো জানতাম, শুধু আমি আর দাদা। কেউ খোঁজও নেয়নি কোনও দিন যে, বাবা-মার পিঠোপিঠি মৃত্যুর পরে কী করে আমাদের দিন কাটছে। লোকেশের সঙ্গে আমার যোগাযোগের ব্যাপার দাদা আভাসে জানত। ছন্নছাড়া বোনের মতিগতি ফিরেছে দেখে, সবচেয়ে খুশি হয়েছিল দাদা। আমার বিয়ের জন্য বাবা টাকা ফিক্সড করে গিয়েছিলেন। মা ভল্টে রেখে গিয়েছিলেন গয়না। সব তোলা হয়েছিল।

আগেই বলেছি, গোড়ার দিকে ওর সঙ্গে প্রেমের অভিনয়ই করতাম। কিন্তু, সেই নৌকাবিলাসের দিন একটা ঘটনা ঘটেছিল। সেদিন পরে ঝড় উঠেছিল। নৌকো দুলে উঠেছিল। ভয়ে ও আমাকে জড়িয়ে ধরেছিল। সেই যে জড়িয়ে ধরলাম, আর ছাড়তে পারিনি। ওকে প্রথম চুম্বন আমার। দেখলাম, জানে না। যেন পুরুষমানুষ, সেভাবে ব্যবহার করলাম ওর অধর। তখন জানল। কোথায় হাত রাখতে হবে, জানে না। বা, মেয়েদের তথাকথিত ভাইটাল পার্টস বলতে কী, জানে না। সেই প্রথম আমিও জানলাম, নিজের মনের ভুলে কখন যে ভালবেসে ফেলেছি ওকে।

লোকেশ বলত, মানুষের একটা শরীর আছে— শুধু এটাই সত্যি নয়। মানুষই শরীর। বা, শরীরটাই হচ্ছে মানুষ। লক্ষ্য করলে দেখবে, সেই সাত সকালে মুখ ধোওয়া, টয়লেট, স্নান, খাওয়া,

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

রাতে কপুলেশনের পর কপুলেশন, ঘুমের পরে ঘুম— সবই তো শরীর-চর্চা। তুমি ওই যে সাদা শাড়িটা পরলে বা এই যে হেয়ার-স্টাইল পাল্টেছ— কেন? না, শরীরটা অন্যরকম দেখাবে। এখানে মন কোথায়? আমরা যে ভাবি শরীরটা একটা ঘর বা খাঁচা আর তার মধ্যে আছে আসল মানুষটা এটা ঠিক নয়। এটা যে কত বড় ভুল, সেটা বোঝা যায় মানুষের অসুখ করলে। 'ক্যান্সার কেন', লোকেশ বলত, 'গাঁটে একটু বাত হোক, কি দাঁতে যন্ত্রণা— যে-কোনও রোগী জানতে পারে তার প্রেম থেকে, দেশপ্রেম থেকে, শোক-দুঃখ-ব্যর্থতা-সফলতা, তার ডিজায়ার এবং নিড— কারও অসুখ করেনি। — অসুখ করেছে কার? না, তার শরীরের! মৃত্যু তো শুধু বডিটাকেই নিতে আসবে তোমার। এমবডিমেন্ট বলতে যা, আশা, স্বপ্ন, কামনা-বাসনা— তার একটিকে সে শুঁকেও দেখবে না। ভাই, তোমার কাছে এসেছে একটা শরীর, আর কেউ আসেনি— কিছু আসেনি— এমনভাবে উপস্থিত হলে গরু-গরু লাগে— তাই মানুষ শরীরের মধ্যে মনুষ্যত্ব ঢুকিয়েছে। আসলে এটা একটা আত্মপ্রবঞ্চনা।

লোকেশ যে এ-সব নিয়ে ভাবে, এমনভাবে বলে থাকতে পারে— তা বোধহয় এই প্রথম আপনি জানছেন। অথচ, আপনি ওর বিবাহিত স্ত্রী। গলায় মঙ্গলসূত্র। বাঃ, চমৎকার। ধরা যাক দু-একটা ইঁদুর এবার!

যাই হোক, প্রসঙ্গে ফিরে আসা যাক। না-না ভুলিনি। সব মনে আছে। তবে, লোকেশ আমাকে এ-সবই বলত। এই ভাষায়। আমি বুঁদ হয়ে থাকতাম শরীর এবং তার বাসনাহীন প্রয়োজন নিয়ে ওর এই মেটাফিজিক্সে।

মাঝে মাঝে মনে হত আমাদের সম্পর্কটা বোধহয় মূলত প্রহৃত আর প্রহারকারীর। মাঝে মাঝে ওকে ক্রিমিনাল মনে হত। কিন্তু তবু বলব, তার বিবেকহীন শরীর-উপাসনাকে, বোধহয় মেয়ে বলেই, আমি স্বীকার না করে পারিনি। তার শরীরের তদ্বির কেউ ক্রিমিনালি করলেও, মেয়েরা জব্দ না হয়ে পারে না, বিশেষত যদি সেই পুরুষটি হয় স্ব-নির্বাচিত।

—সাত —

হে প্রেম, হে নৈঃশব্দ্য

আমার বিয়ের এক সপ্তাহ আগে পর্যন্ত আমি লোকেশকে ডেট দিয়ে গেছি। তারপর যেদিন গড়িয়াহাটের এ-দোকান সে-দোকান ঘুরিয়ে ওর বৌদি আমাকে বেনারসী কেনাল, সেদিনই ঠিক করলাম, আর না। তাহলে আগামীকালই হোক আমাদের শেষ দেখা।

বিয়ের দিন ঠিক করে ওকে বলব না। লোকেশই বারণ করে দিয়েছে বলতে। 'আমার বেনারসী কেনা হয়েছে' বলাই যথেষ্ট হবে। প্রায় হুবহু একই গল্পে ওর আর জি করের বন্ধু দিলীপ সেনগুপ্ত কী করেছিল ম্যাডাম, আপনি কি তাও জানেন না? আমার তো মনে হচ্ছে শুধু লোকেশ আপনাকে নয়, আপনিও কখনও বিবস্ত্র দেখেননি লোকেশকে। অথচ, আপনারা কে? না, স্বামী-স্ত্রী! ছি-ছি। ছিঃ।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আপনি নান হয়ে গেলেন না কেন, বা সন্ন্যাসিনী? হিজড়েদের বস্তিতে গিয়ে উঠলেন না কেন? আপনার কি একটুও অপরাধী লাগে না? মনে হয় না যে, আপনার মতো শো-উইনডোর মহিলা-ম্যানিকিনের জন্যেই আমাদের জীবনে নেমে এল এই অন্ধকার? নইলে তো, লোকেশের আমাকে প্রয়োজনই হত না! উল্টোদিকে, ম্যাডাম, আমার অস্তিত্বের সদর্থক দিকগুলিও আশা করি লক্ষ্য করতে ভুলবেন না। কেন না, আমি সেই কারণ যেজন্যে আপনার তাসের ঘরকে সবাই, এমন কি আপনিও, প্রাসাদ ভেবে গেছেন। বা, ডিভোর্স হয়নি। হুবহু একই গল্পে ভাগনির ফুলশয্যার রাতে দিলীপ ঘাটশিলায় চলে যায়। সুবর্ণরেখার তীরে, রাখি-পূর্ণিমার রাতে, আত্মহত্যা করে। একটি অশ্বত্থের শাখা থেকে সে ঝুলে ছিল। নতমস্তকে।

ওদের অবশ্য ছিল প্রায় ইনসেস্ট। ওর আপন দিদির মেয়ে। উপায় ছিল না। আমাদের ছিল। আর সেটা খুঁজে পেতে আমাকে লোকেশ যেভাবে সাহায্য করেছিল, তা ভুলতে পারি না। আমার উভয়সঙ্কটে ও যে উদারতার পরিচয় রেখেছে, আগাগোড়া রেখে গেছে যে মনের জোর— তা সত্যি অবাক করার মতোই। সিনেমা-থিয়েটার হলে খুনোখুনি হয়ে যেত। কুকুর-বেড়াল হলে একটা মেয়ে-শরীরের দখল নিয়ে কত না আঁচড়-কামড়, রক্তারক্তি। মানুষকে এ-সব জিনিস কত-না গভীর অপরাধ-জগতে টেনে নিয়ে যায়। যখন আর সে মানুষ থাকে না। কিন্তু এমন মানুষ আর ক'জন, যাদের কাছে এরকম ঘটনা খুন বা আত্মহত্যা করার মতো গুরুতর হয়ে দেখা দেয়!

অন্তত, লোকেশ তাদের একজন নয়। আমাদের মিলনের পথে বাধা হওয়া দূরে থাক, সে কি না এগিয়ে এল আমাকে সর্বতোভাবে সাহায্য করতে, আমারই ভবিষ্যতের কথা ভেবে!

'তুমি কি পারবে সত্যিই?'

'কেন পারব না। কথায় বলে, সব ভাল যার শেষ ভাল। এ তো সেইরকম।'

'তুমি কি আমার ওপর সব দাবি ছেড়ে দিচ্ছ?'

'দ্যাখো, এটা একটা খুন যা আমরা দুজনে মিলে করছি।'

'আমার ভাল হবে বলে?'

'না, আমাদের ভাল হবে বলে।'

'যোগাযোগ কি থাকবে?'

'দেখা হয়ে যেতে পারে, কিন্তু সেখানে পূর্বমেঘের ছায়াটুকুও থাকবে না।'

'কেন থাকবে না?'

'কারণ, এটা একটা খুন যা আমরা করছি। সাক্ষ্য-প্রমাণ রাখা যাবে না।'

'আমার যৌবনের ছটা বছর কি মিথ্যা হয়ে যাবে?'

'বললাম তো, এটা একটা খুন যা আমরা করছি।'

'তুমি কি যে-কোনও মেয়েকে এভাবে চলে যেতে দিতে?'

'আইডেন্টিকাল সিচুয়েশানে. হ্যাঁ। তবে তাকেও'. শেষ হাসি হেসে লোকেশ বলল. 'ঠিক তোমার মতো হতে হবে।'

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

তার প্রতি আমার এই পরম নির্ভরতা বা সীমাহীন কৃতজ্ঞতা, যাই বলুন, বিয়ের এক সপ্তাহ আগে পর্যন্ত আমাকে তার সঙ্গে যোগাযোগ রেখে যেতে সাহস জুগিয়েছে। শেষের সেই দিনগুলো যে কীভাবে কেটেছে, তা আমি নিজেই জানি না। সে কী অবর্ণনীয় অপরাধবোধ! আমার ভাবী স্বামী, তখন সে বা তার আত্মীয়স্বজন, আমার দাদা, এবং আমার বিয়েতুতো নিজের আত্মীয়স্বজন— একদিকে ওদের দাবি। অন্যদিকে কোথাও না কোথাও অপেক্ষমাণ লোকেশ। তিন-চার ঘণ্টা পরে গিয়ে দেখেছি, বসে আছে। আপনি টের পাননি ম্যাডাম, কিন্তু ডাক্তারি-ফাক্তারি ও তখন বিলকুল ছেড়ে দিয়েছে। প্রায় শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত সমস্ত খুঁটিনাটি সে জেনেছে। নাটক বোর্ডে নামাবার আগে যে-ভাবে পরিচালক সব জানে। সব দ্বিধাদ্বন্দ্ব পেরিয়ে যেতে সাহায্য করেছে। যেমন, আমি কি বিয়ের আগে ওকে সব বলব? নাকি, বিয়ের পরে, কোনও সময়? যে আমার স্বামী, তার কাছে এমন একটা গুরুতর বিষয় লুকিয়ে রাখার ভার আমি সারাজীবন বইব কী করে? (উত্তরে গীতা থেকে শ্লোকে উচ্চারণ করে) (কর্মযোগে আছে, বলেছিল) লোকেশ আমাকে বলে, কিছুই জানাতে হবে না। কিছু জানতে চাইবে না। কা হল সেই ধোঁয়া যা অগ্নিকে ঢেকে রাখে। সেই মল, যা ঢেকে রাখে দর্পণ। কোনও ছায়া সেখানে ড়তে দেয় না। পাঁক ঘাঁটিয়ে সেই পাতালে তুমি ওকে নিয়ে যাবে? দমবন্ধ করে দেবে ওর? 'প্রশ্ন। করবে। না।' লোকেশ বলেছিল শব্দগুলো কেটে কেটে।

যেদিন বেনারসী কেনা হল, তার পরদিন সকালবেলা আমরা বসেছিলাম পুরনো নিউ মার্কেটের মধ্যে ফ্লুরি... ছোট্ট দোকানটার দোতলায়। প্যাসেজের দিকে সিলিং পর্যন্ত গ্লাস প্যানেল। বাজারের শব্দ ভেতরে ঢোকে না। সাদা-লাল টিউনিক-পরা ওয়েটার। লোকেশের খুব পছন্দের দোকান। বিলেতে নাকি এমন কফি-শপ অনেক, যা কিছু বাঁধা খদ্দেরের একেবারে নিজের জায়গা। শীতের সকাল। সবে মার্কেট খুলেছে। প্যাসেজেও লোকজন নেই বলতে গেলে। শুধু আমাদের জন্যই কফি-মেশিন প্রথমবার চালু হল।

টেবিলের ওপর রাখা ওর দু'আঙুলের ফাঁক থেকে সিগারেট খুলে নিয়ে অ্যাশট্রেতে ফেলে আমি বললাম, 'কাল বেনারসী কেনা হয়েছে।'

আমার চোখে ছাই-রঙা কনট্যাক্ট লেন্স। নাকে নাকছাবি। সেবার বোম্বে গেল। ফিরে কিছুই বলেনি। কয়েকদিন পরেই পরপর দু-দুটো রেজিস্টার্ড পার্সেল। একটায় লেন্স। অন্যটায় নাকছাবি। এই বুড়ি-বয়সে লোকাল অ্যানাসথেসিয়া করে লোকেশ নিজের হাতে নাকের পাটা ফুটো করে দিয়েছিল।

কবে বিয়ে, জানতে চাইবার কথা নয়। জানতে চাইল না। হেসে বলল, 'সাদা কিনলে আশা করি।' কী অদ্ভুত আত্মপ্রত্যয় ওর মুখে-চোখে! আমি স্তব্ধ হয়ে গেলাম।

'তুমি শুনলে অবাক হবে', আমি বললাম, 'আমি সাদাই কিনলাম। সাদার ওপর রুপোলি কাজ।'

'সঙ্গে কে ছিল?'

'ওর বৌদি। উনিই দাম দিলেন।'

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

কফির সঙ্গে এরা দেয় সুন্দর লম্বাটে কাঠের চামচ। লোকেশ কাঠি নাড়াতে লাগল। দীর্ঘ না হলেও একটা ছোট্ট প্রশ্বাস পড়ল তার, আমি লক্ষ্য করলাম। ঠিকই যে, এমনটা হওয়ার কথা নয়। আমি কিন্তু অবাক হইনি। বরং আমি বুঝি, আমার পক্ষ থেকে তাকে সান্ত্বনা দেওয়ার সেই বহু-প্রত্যাশিত মুহূর্ত অবশেষে উপস্থিত হয়েছে। লোকেশ যা বলে থাকে, কুকুর-বেড়ালের সঙ্গে মানুষের অনেক মিল, ঠিকই। শুধু এই একটুখানি ছাড়া। যখন আবেগ। বা, অনুভব। ওর হাত দুটো ধরে কিছু বলার ইচ্ছা আমার মধ্যে প্রবল হয়ে উঠতে লাগল, অথচ ভয়, সান্ত্বনা দিতে গেলে যদি ঘৃণা ভরে সে আমার হাত দুটো ঠেলে দেয়। শুধু আজকের দিনটা, এই শেষ দিনটা, যদি ভালয়-ভালয় না কাটে তাহলে আমার এক-জীবনের ভুলচুক হয়ে যাবে। কিন্তু, শেষ পর্যন্ত আমার আবেগই জয়ী হল। যদি প্রত্যাখ্যান করে তো করুক। মনে হল, ওর এই মিথ্যে উদারতার সামনে মাথানিচু করে বসে থাকার চেয়ে সেই সত্যি ঘৃণার মুখোমুখি দাঁড়ানো ভাল। ওর হাত আমি নিজের দুই মুঠির মধ্যে টেনে না নিয়ে পারলাম না।

'এই, তুমি কি জেলাস বোধ করছ?'

'না তো।' আবার সেই অসহ্য আত্মপ্রত্যয়, 'একটুও না।'

'আর ইউ শিওর?'

'জেলাস কেন জয়ন্তী।' আমার মুঠো থেকে হাত খুলে নিয়ে লোকেশ শান্ত গলায় বলল, 'এ তো আমি আগে থেকেই ঠিক করে রেখেছি আমি জেলাস হব না। আমি প্রকৃতি-বিরোধিতা করব। তাই না? আমি কথা দিয়েছি'— একটু চুপ করে থেকে সে বলল, 'আমাকে'।

মনে হল মন্ত্রপাঠ করছে। হ্যাঁ, মন্ত্রমুগ্ধের মতোই আমি আবার মাথা নিচু করলাম।

না, ভুল আমি করিনি। ভুল লোককে বাছিনি। ভুল লোকের ডাকে বারবার বিছিয়ে দিইনি আমার আমাকে। কত সহজ ভাবে নিচ্ছে? যেন কিছুই হয়নি। যেন কিছুই ঘটতে যাচ্ছে না। ওর বা আমার জীবনে।

আজ আমি নয়, লোকেশই ডেকে এনেছে আমাকে। কিন্তু কেন, সেটাই জানা বাকি ছিল তখনও।

'আমরা দুজনে মিলে এটা ঠিক করেছি, এটা একটা খুন যা আমরা করব। আর পৃথিবীর সব খুনি যা করে থাকে, এর সমস্ত সাক্ষ্য-প্রমাণ আমরা নষ্ট করে দেব।' এই বলে লোকেশ আমার চোখের ওপর সেই দৃষ্টি রাখে যার পলক পড়ে না।

সাক্ষ্য? প্রমাণ? কী বলতে চায় লোকেশ?

আমাদের এতদিনের সম্পর্কের আমরা কোনও প্রমাণ রাখিনি। কোনও চিঠিপত্র দিইনি। শুধু টেলিফোন। রাস্তাঘাটে ক্বচিৎ একসঙ্গে হেঁটেছি। সিনেমা হলের লবিতে অচেনার মতো দাঁড়িয়ে থেকেছি। দেখা হয়েছে হলের অন্ধকারে। যখন আমি বা লোকেশ এ ওর পাশে গিয়ে বসেছি। চেনা কেউ মুখোমুখি হয়ে গেলে, কেউ কারুকে আলাপ করিয়ে দিইনি। আর, আমাদের মধ্যে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বয়সের তফাতও বছর-পনের, টপ করে কেউ যে বিশেষ কিছু ভেবে নেবে সে সম্ভাবনা ছিল কমই। অন্তত, আমরা সেভাবেই থাকতাম, প্রকাশ্যে যেটুকু। বেছে বেছে সেই সব রেস্তোরাঁতেই গেছি, অন্তত দিনের বেলায় যেগুলো অপ্রচলিত, যেমন এই ফ্লুরি। আর অ্যাস্টর-এর রাত্রির বাগানে তো আলোর চেয়ে অন্ধকারই বেশি।

কোটের পকেট থেকে একটা ব্রাউন রঙের খাম বের করে রাখল লোকেশ। টেবিলের ওপর।

'কী ওগুলো?'

কী, আমি বুঝতে পেরেছি। খামের খোলা প্রান্তে হাফ-সাইজ একগোছা ফটোগ্রাফের আভাস আমি দেখতে পেয়েছি। ওর মুখের এই সমাহিত হাসি এ আমি কোথায় দেখেছি? ঠিক জিনিস ঠিক সময়ে মনে পড়ে শুধু উপন্যাসে। বাস্তবে, এরকম সময় মন শরীর ছেড়ে পালায়। কিন্তু, আমার নির্ভুলভাবে মনে পড়ল, গত ফিল্ম-ফেস্টিভালে লোকেশের সঙ্গেই দেখা একটি ডাচ ফিল্মের (দ্য মিউজিক মাউন্টেন) কথা যার একটি দৃশ্যে তিন-চারদিন ধরে বরফ-চাপা এক মধ্যবয়সিনী মৃতের মুখে দেখা দিয়েছে— পচনজনিত বিক্রিয়ার কারণেই— জীবিতের মুখে দেখা দিলে যাকে বলা হত স্বর্গীয়— সেই ভয়াবহ হাসি। আমি ভয় পেয়েছি বুঝে লোকেশ আমার গায়ে হাত রেখেছিল, যদিও স্তনে।

হঠাৎ, বলা নেই কওয়া নেই, দুপ দুপ করে আওয়াজ শুরু হল আমার বুকের মধ্যে, সঙ্গে সঙ্গে কপালে ঘাম, ওই খামটা ছোঁ মেরে তুলে এখান থেকে দৌড় মারার অপ্রতিরোধ্য ইচ্ছায় মুখিয়ে উঠল আমার সর্বশরীর। কোথায় যাব তা জানি না। শুধু মনে হল, আমি দৌড়ব, দৌড়ব, দৌড়ব। ঝোপঝাড় ভেঙে শুধু লাফে লাফে দৌড়— এমনকী পাহাড়ও ডিঙিয়ে— সমুদ্র যদি পথরোধ করে তো ভালই। ওই বিষধর সাপ হাতে ঝাঁপিয়ে পড়ব। আর, আঃ, তারপর কেউ আমাকে খুঁজে পাবে না।

'যেমন, এগুলো।' অতি সন্দেহজনক ঠাণ্ডা গলায় লোকেশ বলল, 'সাক্ষ্য এবং প্রমাণ।'

'সেই ছবিগুলো! ভুলেই গিয়েছিলাম আমি। এ একেবারে সেই গোড়ার দিকের কথা। যখন আমার বয়স উনিশ আর লোকেশের পঁয়ত্রিশ। যখন যেদিন জোকার রিসর্টে প্রথম অর্গ্যাজম, ভেতরে-বাইরে কেঁপে সর্বস্ব উজাড় করে দিয়ে যখন ও কিছু না দিলে আমার আর ওকে ফিরে দেওয়ার মতো কোনও সম্বলই নেই। (আমি রবীন্দ্রনাথের 'ওগো কাঙাল' গানটির কথাই এখানে ভাবছি)— সেই সময় ও আমার এক রিল ন্যুড তুলে ছিল। মৃদু প্রতিবাদ যে করিনি আমি, তা নয়। কিন্তু তখন আমার শরীর ন্যাতা, মনেও নেই জোর। ফ্ল্যাশের ওপর ফ্ল্যাশ দিয়ে আমাকে উল্টে পাল্টে, শুয়ে, বসিয়ে, দাঁড় করিয়ে পুরো এক রিল রঙিন ছবি সে তুলে ছেড়েছিল। লোকেশ পরে দেখিয়েও ছিল আমাকে ছবিগুলো। খুব আপত্তিকর মনেও হয়নি তখন। ঠিক ন্যুড বলতে যা, তা তো নয়। ওগুলো ছিল আমার অঙ্গপ্রত্যঙ্গ বা অংশের ছবি— আমার চোখ, আমার চুল, আমার বাহু, হাতের পাতা, আমার ঠোঁট, আমার পা (জাস্ট ঊরু পর্যন্ত), আমার স্তন— এবং আমার মুখ। সব আলাদা আলাদা। মূলত নান্দনিক প্রয়াস। আর ফটোগ্রাফিতে ওর হাত যা দুর্দান্ত! শুধু জোড়া দিলেই ও থেকে আমার ন্যুড বলতে যা, পাওয়া যেতে পারে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সাতদিন পরে আমার বিয়ে। চিঠি লিখিনি কখনও বলে নিশ্চিন্ত ছিলাম। হা আমার কপাল, আমি ছবিগুলোর কথা ভুলে গিয়েছিলাম কী করে! আর এতদিন পরে ও ছবিগুলো এনেছেই বা কেন? কেন, হাত চাপা দিয়ে রেখেছে? না হলে তো এতক্ষণ আমি ছোঁ মেরে তুলে নিতাম ওগুলো। খুন হয়ে যাওয়ার আগে ওই খামটা কেউ আমার কাছ থেকে কেড়ে নিতে পারত না।

ম্যাডাম, মনের কথা শোনা যায় না, আর ভাগ্যিস। এতে কোনও ভুল নেই আমার জীবনের কোটি-কোটি মুহূর্তের মধ্যে ঠিক পরেরটাই ছিল বিধিনির্দিষ্টভাবে, খামটা ছিনিয়ে নেওয়ার মুহূর্ত। তারপর শুরু হত সেই দুঃস্বপ্নের দৌড়। থামত সমুদ্রের সামনে।

কিন্তু, তার বদলে, আমি দেখলাম, আমার লাংসদুটি পুরোপুরি খুলে যাচ্ছে। দেখলাম এত গভীর এক প্রশ্বাস নিচ্ছি আমি, যা জীবনে আগে কখনও নিইনি। মাথার মধ্যে রক্তের ফুটুনিও স্তিমিত হয়ে এল।

ছবিগুলো একটা একটা করে ছিঁড়ে ফেলছে লোকেশ। এমনকি নেগেটিভ রিলটাও বের করল এবং কুটিকুটি করে ছিঁড়ল। মোট চব্বিশটা। ছবি তো ওর হাতে একটাও মিস হয় না।

টয়লেটে গিয়ে টুকরোগুলো ফেলে এল লোকেশ।

প্রায় আধঘণ্টা হয়ে গেছে। রেস্তোরাঁয় এখনও তৃতীয় ব্যক্তির আবির্ভাব ঘটেনি। প্যাসেজে লোকজন এখনও কমই। বিশাল গ্লাস প্যানেলের ওপারে উল্টোদিকে নাহুম-এর দোকানের মধ্যে কেক কিনছে এক মৌন দম্পতি। ওই দেখ, কালো-সাদা ছিট পুলোভার পরা ওদের বাচ্চাটা কাচের দরজা খুলে বেরিয়ে পড়ল। মা-বাবা কিছুই জানে না এখনও। ওম্মা, সাহস দেখ ছুঁড়ির, টলোমলো পায়ে ওইদিকে হেঁটে যাচ্ছে। কেউ যদি তুলে নেয়? মেয়ে-বাচ্চা বলে কথা! আরব কানট্রিজে চালান দিতেই পারে। না-না, নাহুম-এর মোটাসোটা থলথলে ফেজ-মাথায় ইহুদি মালিক দেখতে পেয়েছেন। ওই যে, নিজেই উঠে যাচ্ছেন কাউন্টার ছেড়ে। বিচ্ছুটাকে ধরে আনতে। ওঁকে দেখেই খিলখিলিয়ে হাসি। এবার পড়ি-মরি দৌড়। সব মিলিয়ে সাইলেন্ট মুভির একটা দৃশ্য যেন।

ওয়েটারকে আর একপ্রস্থ কফি-প্যাস্ট্রি দিতে বলল লোকেশ। সেও দেখছিল। দৃশ্যটা। তখন আমার চোখ ছলছলে, আবেগে টসটস করছে মুখ, যখন আমার হাত ছুঁয়ে লোকেশ আমাকে বলল, 'ঠিক ওইরকম একটা ফুটফুটে বাচ্চা হবে তোমার।'

তারপর অভিভূত আমাকে শেষবারের মতো নিয়ে গেল সদর স্ট্রিটের ফেয়ারলন হোটেলে। কেউ কিছু জানতে চাইল না। মালিকের স্ত্রী ওর পেশেন্ট। আমার ধারণা ছিল ওকে যা দেওয়ার আমি সব দিয়েছি এবং তার বেশি কিছু দেওয়া যায় না। কিন্তু, আমি সেদিনও বুঝিনি যখন জোকার রিসর্টে ওর বুকের মধ্যে ন্যাতা হয়ে যাই। একজন পুরুষকে সর্বস্ব নিঃশেষে দেওয়া বলতে কী বোঝায়, আমি সেই একদিন, সেই মাত্র একবার বুঝি। আমি স্বীকার করতে বাধ্য যে আমার সংক্ষিপ্ত বিবাহিত জীবনে অমন অভিজ্ঞতা আমার হয়নি। সেই প্রথম টের পেলাম ওর সঙ্গে এতদিন প্রয়োজন মিটেছিল। আজ মিটল কামনা। শুধু শরীর যা মেটাতে পারে না। এমন অভিজ্ঞতা এক জীবনে দু'বার হয় না, কোনও মেয়ের।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

—আট—

ও, সোমনাথ!

বিয়ের পর লোকেশ কিন্তু কথা রেখেছিল।

পথে-ঘাটে হঠাৎ মুখোমুখি হওয়ার কথা নয়। ওর যাতায়াত গাড়িতে। যাতায়াতের পথে গাড়ির সানগ্লাসের ভেতর দিয়ে যদি দেখেও থাকে কখনও, গাড়ি থামায়নি। এগিয়ে আসেনি।

ওর ওপর পুরোপুরি আস্থা আর বিশ্বাস থাকা সত্ত্বেও, আমি তবু কয়েকটি বিবাহোত্তর সাবধানতা অবলম্বন না করে পারিনি। কেন না, এ-সব অদ্ভুত আবেগের ব্যাপার। অঙ্ক নয়, এরা জ্যামিতি। এরা 'ধর, AB একটি সরলরেখা।' এরা 'ধর, ABC একটি ত্রিভুজ।' এরা 'ধর ABCD একটি ট্রাপিজিয়ম।' এদের সমস্ত শুরুই ধরতাই দিয়ে। তাই এখানে থাকে বিসমিল্লায় গলদ। প্রগলভতা মাফ করবেন ম্যাডাম, কতদূর, প্রায় অন্তস্তল পর্যন্ত দেখে নিয়ে আমি আমার উত্তর-বিবাহজীবনের সতর্ক পদক্ষেপগুলি রেখেছিলাম তা বোঝার সুবিধের জন্যই আমি জ্যামিতির উপমাটি নিলাম। ওর বন্ধু দিলীপ সেনগুপ্তর আত্মহত্যার কাহিনী আগে বলেছি। সে তো প্রায় একই গল্প। আমি ভেবেছিলাম, হয়ত সেই কথাই ওর মনে পড়ছে যখন লোকেশ আমাকে বলেছিল, 'তবে তোমার বিয়ের দিনটা ঠিক কবে, সেটা আমাকে বলবে না। আমি জানতে চাই না।' বিসমিল্লায় যদি গলদই না থাকবে, তাহলে বলবে কেন ও-কথা, আপনিই বলুন। আমি বলিওনি।

সতর্কতা বলতে ওর সঙ্গে সেই সব রেস্তোরাঁ বা হোটেলে আমি কখনও যাইনি, যেখানে, অন্তত একের অধিকবার লোকেশের সঙ্গে গেছি। সৌভাগ্য যে মাত্র দু'চারটি রেস্তোরাঁ বা একটি-দুটি হোটেলের মধ্যেই আমাদের যাতায়াত সীমাবদ্ধ ছিল। যেখানে আমাদের চেনাশোনা কেউ বড় একটা যায় না। বিয়ের পর রাস্তায় বেরনো আমি ছেড়েই দিলাম এক রকম, অন্তত যখন সে পাশে নেই। সেও একটা সতর্কতা। অন্তত একটা প্রাথমিক বাধা তো বটেই, লোকেশের এগিয়ে আসার পক্ষে, আমার যুবক স্বামীর এই সর্বক্ষণ উপস্থিতি! এর পরেও উল্টো-সিধে যদি করে লোকেশ, আমার স্বামী দেখবে। বিবাহিত জীবনের প্রথম রাত্রির অভিজ্ঞতাই আমাকে জানিয়ে দিয়েছিল, স্বামীর চেয়ে অধিক নির্ভরযোগ্য আর কেউ নেই। কেউ হতে পারে না। হাজার হাজার বছরের সংস্কার এখানে কাজ করেছিল আপনি বলতে পারেন। এই একটা জায়গায় আপনাতে-আমাতে কোনও তফাত ছিল না মিসেস গাউর। বিশ্বাস হচ্ছে বিশ্বাস। সকল চক্ষুষ্মানতার মধ্যে বিশ্বাস হল কেন্দ্রীয় অন্ধত্ব। একে কে অস্বীকার করবে।

আমার স্বামীর প্রসঙ্গ এই গল্পে নিতান্তই অপ্রাসঙ্গিক। তবু কেন যে সে এসে গেল বারবার! আমার এ পাপের গল্পে তার নাম মুখে আনতে লজ্জা হয়। আমি চেষ্টাও করেছি না আনতে, আপনি লক্ষ্য করেছেন। আমার অস্তিত্ব টলে যায়, তার নাম উচ্চারণ করলে, আগুন হয়ে সে আমাকে ঘিরে ধরে। জ্যোৎস্নায়, সুবর্ণরেখা তীরে, অশ্বত্থের ডাল থেকে যে আজও ঝুলে আছে, সেই কবি, সে তো সোমনাথ। ওই দেখুন, আমার মন আমাকে ছেড়ে পালিয়ে যাচ্ছে।

হায়, সোম! ও, সোমনাথ!

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

—নয়—

‘যখন সময় থমকে দাঁড়ায়’

প্রায় আধঘণ্টা পরে আবার লিখতে বসেছি। কাঁদছিলাম ভাববেন না যেন, মিসেস গাউর। সে বাঁদীই আমি নই। ঘর ছেড়ে বাইরের শালবনটায় একটু ঘুরে এলাম। সেই সকাল থেকে লিখছি। হাতও টনটন করছে। এখন বেশ সাফসুতরো লাগছে। হ্যারিকেন জ্বালিয়ে আবার লিখতে বসেছি।

শালবন? আমি তাহলে কোথায়! এ সম্পর্কে আপনার প্রচণ্ড কৌতূহল হওয়া স্বাভাবিক। আপাতত এইটুকু ভেবে নিন, পাইনবন যখন না, নিশ্চয়ই শিলং কি মুসৌরি নয়।

আর, যদি ধরে নিই উমেশবাবু এই চিঠি আপনাকে পড়ে শোনাচ্ছেন, তাহলে জানাবেন, এই মুহূর্তে তার চেয়ে বেশি হাসির খোরাক আমার কাছে আর কিছু হতে পারে না। সেদিন করিডোরের আলো কাটা ছিল। দরজায় মাত্র একবার-দেখা দাদাকে আপনি চিনতে পারেননি, আপনার কথা অন্য। কিন্তু, দাদার ছবির ওপর একটি দাড়ি, এক বিঘৎ জুলপি, সঞ্জয় দত্ত কেশদাম আর একটা গগলস বসিয়ে দিলেই তো ‘ভগীরথ’-কে চেনা যেত। বেচারা উমেশ সামন্ত। শেয়ালদায় পচা ডিম বেচতে বলুন, ম্যাডাম।

হ্যাঁ, সতর্কতার বিষয়ে কী যেন বলছিলাম আপনাকে? ও-হ্যাঁ, মনে পড়েছে। যা বলছিলাম। দেখুন ম্যাডাম, বিপদ যে শুধু বাইরে ছিল, তা তো নয়। যেমন, হৌ-হুয়ার মালিক লি ইয়ং একদিন টেবিলে এসে জানতে চাইল, ‘হাউ ইজ ডাঃ গাউর মিসেস...’ ‘আমি সোমনাথকে দেখিয়ে বললাম, ‘লাহিড়ী।’ লি আর কথা বাড়াল না। আমি ঢুকতে চাইনি। সোমনাথই বলল, যে চিমনি পুডা ওখানে ছাড়া আর কোথাও পাওয়া যায় না। জোর করে নিয়ে গেল। সোমনাথ ‘ডাঃ গাউর’ বিষয়ে কোনও আগ্রহ দেখায়নি যদিও। আমিও বলিনি যে ‘চিমনি’ নানকিং-এও পাওয়া যায়। আর সেটা ক্যান্টনিজ! ঢের বেশি স্পাইসি। আর ফার বেটার। ওখানে কেউ যায় না। তাই আমাকে বহুবার নিয়ে গেছে লোকেশ।

আকাশ নেই। তবু ঘরের মধ্যেও মেঘের কী ঘনঘটা, আপনি দেখুন। লোকেশের দেওয়া সব উপহারই আমি বিয়ের আগে নষ্ট করে ফেলেছিলাম। শুধু নাকছাবিটা পারিনি। হ্যাঁ, ৩৫০০০ টাকা দাম বলেই। কিন্তু সোমনাথ যেদিন জানতে চাইল, ‘এটা কি হীরে?’ আমি বললাম, ‘হ্যাঁ।’ কিন্তু ও যখন জানতে চাইল, ‘আসল?’ তখন তো ওটা ছুঁয়ে! আপনি কি অনুমানও করতে পারেন মিসেস গাউর, কে তখন কী ছুঁয়েছিল? তার নিষ্পাপ এসে ছুঁয়ে ছিল আমার পাপকে। তার বিশ্বাস এসে ছুঁয়েছিল বিশ্বাসঘাতিনীকে। শিউরানিতে গা আমার নরম হয়ে এল। আমি একবার কেঁপে উঠে নেতিয়ে পড়লাম ওর বুকে। ও ভাবল, প্রেম। কিন্তু তখন আমি ওর মধ্যে পেতে চাইছি একটা তৃণখণ্ড। আঁকড়ে ধরতে চাইছি। কারণ, তখন আমি ভড়ভড় করে ডুবে যাচ্ছি চোরাবালিতে। আপনি বুঝতেই পারছেন, ততদিনে আমি সোমনাথকে ভালবেসে ফেলেছি। ‘ভালবেসে ফেলেছি’ একটা কথার কথা। কিন্তু, বিশ্বাস করুন ম্যাডাম, ‘ততদিনে ওর মধ্যে আমি হারিয়ে গেছি’ কথাটা তা নয়।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ততদিনে, যুবক-স্বামীর আমি প্রেমাসক্তা পত্নী। বিপত্নীক শ্বশুর-পিতার কনিষ্ঠ পুত্রবধূ। দুই দেওর ও কিশোরী ননদের বৌদি। বয়ঃজ্যেষ্ঠ ভাসুরের ভাদ্রবৌ, তাঁর সন্তানদের কাকিমা। দূর আর নিকট সম্পর্কের কতজনের আমি ততদিনে কত কী যে। মার, মাতৃসমা ওর এক খুড়তুতো দিদির দৌহিত্রের রাঙাদিদা!

তারপর ... একদিন উপস্থিত হল সেই কেউটে— কালো দিন।

এত সতর্কতা, এত আত্মরক্ষা, হায়, সবই যে চোরাবালি তা তখন কে জানত। জীবনের সুসময়? হাঃ। সে তো চরম সর্বনাশের কাছে টেনে নিয়ে যাবে বলেই। আমি তখন বুঝিনি। তাই, বিনা মেঘে বজ্রপাতের মতো হঠাৎ মুখোমুখি দেখা হয়ে গেল সেই অগ্নিগর্ভ দিনটির সঙ্গে: ৪ নভেম্বর, ১৯৮৯।

হুড়মুড়িয়ে কোথা থেকে যে নেমে এল ডুয়ার্সের নামহীন, ছিন্নমস্তা নদী। হাতে তার রক্ত-রাঙা খাঁড়া। সে জল-তোড়ের তো নির্দিষ্ট কোনও খাঁড়িই নেই! নেই অনুমেয় কোনও গতিপথ। যেখান দিয়ে সে চলে যাবে, সেটাই হয়ে যাবে তার রাজপথ। সে চলে গেলে পড়ে থাকবে ধ্বংসের চরাচর, শুধু নুড়ি আর বোল্ডার, ওপড়ানো গাছ, আর ভাঙা ঘর-সংসার।

ওই দিনটা লোকেশের সঙ্গে যমুনার নাইট শো-তে 'দা ফরবিডন ড্রিমস' ছবিটা দেখতে গিয়েছিলেন, মনে পড়ে? মনে পড়ে কি, মিসেস গাউর? এমনিতেও ভোলার কথা তো নয়। ৪ নভেম্বর আপনাদের বিয়ের তারিখ। কিন্তু, এই দিনটির অবিস্মরণীয়তার দাবি সম্পূর্ণ ভিন্ন প্রকৃতির। আপনার, আমার— দুজনের কাছেই।

গ্লোবে ইস্টভান জাবোর 'মেফিস্টো' রিলিজ হয়েছে। বিজ্ঞাপন দিয়েছে '৮৬-র কলকাতা ফিল্ম ফেস্টিভালের সেরা ছবি' বলে। সোমনাথ চেয়েছিল গ্লোবে ঢুকতে। শুনে আমি বলেছিলাম, 'দূর! বিজ্ঞাপনে কত কী লেখে।' সোমনাথ বলল, 'না-না। কাগজেও তাই বলছে।' আমি বললাম, 'তাই?'

নিঃসন্দেহে লোকেশেরও মত ছিল তাই। '৮৬ ফিল্ম ফেস্টিভালে অনেকগুলো ছবি আমরা একসঙ্গে দেখেছিলাম। মিউজিক মাউন্টেন-এর কথা আগে বলেছি। 'মেফিস্টো' রবীন্দ্রসদনে দেখিয়েছিল। মেফিস্টো বলতে মেফিস্টোফেলিস। নাজি আমলের থিয়েটার-পাগল এক জার্মান অভিনেতার গল্প। শিল্পীর সঙ্কট নিয়ে এমন নিখুঁত ভাল ছবি আগে কখনও হয়নি আর ভবিষ্যতেও হবে না, লোকেশ বলেছিল। আগাগোড়া এত তন্ময় হয়ে দেখেছিল লোকেশ যে ইশারায় বারেকের জন্যেও আমাকে ব্লাউজের বোতাম খুলতে বলেনি। জানি, আপনি লক্ষ্য করছেন, আমার চিঠিতে শরীরের ব্যাপার, বায়োলজির অগ্রাধিকারের প্রসঙ্গ, বারবার, বোধহয় একটু মাত্রা ছাড়িয়েই এসে যাচ্ছে। পারভার্ট ভাববেন না, ম্যাডাম। তথা, নিমফো। এবং এজন্যে আমি লোকেশকেও একটুও দোষ দিই না। এজন্যে বরং সম্পূর্ণ দায়ী যৌনতা সম্পর্কে আপনার খড়ের-গাদার-কুকুর দৃষ্টিভঙ্গি। তাছাড়া আমাদের তো সারারাতের বৈধ বিছানা ছিল না। যে, সারাদিন ভাই-বোনটি হয়ে থাকব।

দেখা ছবি। কী থেকে কী মনে পড়বে। তাই বলেছিলাম, 'নাঃ। একটা সাদামাটা ছবি দেখি চল।' কাগজ দেখে আমি দা ফরবিডন ড্রিমস-এর কথা বলি।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

'সাদামাটা?' সোমনাথ বলল, 'স্ট্রিকটলি ফর অ্যাডাল্টস, তা জানো?'

'চলো না।' হাসতে হাসতে আমি বললাম, 'তোমার শিশুদশা যে এখনও কাটেনি, সে তো আর ওরা টের পাবে না। বুকটুক ফুলিয়ে, 'তুমি আ-মার সঙ্গে যাচ্ছ।'

ঠোঁট বুজিয়ে লিপস্টিক লাগাচ্ছিলাম। তাই সোমনাথ ভেবেছিল বলা শেষ। কিন্তু কাঁধের ওপর বালুচরির আঁচল গুছিয়ে রাখতে রাখতে ড্রেসিং টেবিলের তিন-তিনটি আয়না থেকে একযোগে কটাক্ষ করে আমি আরও বলেছিলাম, 'দেখতে তো বড়সড়ই।'

'এই! এই! বয়সের খোঁটা দেবে না বলে দিচ্ছি', যথারীতি রাগ করেছিল সে।

আসলে সোমনাথ আমার চেয়ে বয়সে দু'বছরের ছোট। এ নিয়ে কথা উঠেছিল এবং ওদের বাড়িতে আপত্তিও ছিল। যাই হোক, স্বামীর চেয়ে দু' বছরের বড় হয়ে কোথায় আমি লজ্জিত হব, এই নিয়ে, বিয়ের পর থেকে চান্স পেলেই আমি ওকে খোঁটা দিই। এ বিষয়ে বিশেষ চ্যাঁ-ভ্যাঁ করলে নাক তো বটেই আমি ক্বচিৎ ওর কানও পাকড়াই।

'হুঁঃ। হাসলে গালে টোল পড়ে এখনও! দুধের বাছা কোথাকার!' বলে আমি হাসতে থাকি। অনেক সময়ই প্রাণপণ চেষ্টায় সোমনাথ এ সময় হাসে না।

CAMILLE

★★★★★

DIRECTOR: George Cukor

CAST: Greta Garbo, Robert Taylor, Lionel Barrymore, Henry Daniell, Laura Hope Crews, Elizabeth Allan, Lenore Ulric, Jessie Ralph

Metro-Goldwyn-Mayer's lavish production of the Duma's classic provided screen goddess Greta Garbo with one of her last unqualified successes and remains the consummate adaptation of this popular weeper. The combined magic of the studio and Garbo's presence legitimized this archaic creaker about a dying woman and her love affair with a younger man (Robert Taylor, soon to be one of MGM's biggest stars). This is a richly textured film made as only MGM could, transforming accepted masterpieces into celluloid facsimilies that audience could understand and appreciate without having to read. If you've never seen Garbo, watch this or *Ninotchka*.

1936 B & W 108 minutes

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ভাবখানা, কী দরকার বাবা। ফের গালে টোল পড়িয়ে!

'টোল তো ক্লার্ক গেবল-এরও পড়ত।' একদিন ভয়ে ভয়ে বলে ফেলেছিল সোম। ভয়ে ভয়ে এইজন্যে যে, সে জানে বিয়ের আগে আমি ছিলাম একটা পুরোদস্তুর ফিল্ম-বাফ।

কিন্তু বলে-তো-ছে। আর যাবে কোথা!

'ফের ক্লার্ক গেবল!' ওকে ধমক দিয়ে আমি গড়গড়িয়ে বলে যাই, 'ক্লার্ক গেবলের কী জানো শুনি? গন উইথ দা উইন্ড ছাড়া কী দেখেছ? ইট হ্যাপেন্ড ওয়ান নাইট— নাম শুনেছ? সেরা ছবি, দা মিসফিটস। বুড়ো কাউবয়। সঙ্গে মন্টেগোমারি ক্লিফট। নায়িকা মারিলিন মনরো।'

৮০ থেকে ৮৪— এই চার বছর ছিল আমার জীবনের চলচ্চিত্র সময়। যখন একা একা দেখতাম। '৮৪-র শুরুতে আমাদের ফিল্ম-ক্লাব থেকে দেখাল জর্জ কুকুর-এর বিখ্যাত প্রেমের ছবি— ক্যামিলি। নায়িকা গ্রেটা গার্বো। নায়ক রবার্ট টেলর। একা একা কাঁদতে কাঁদতে চোখ ফুলে ঢোল হয়ে গিয়েছিল আমার। গেটের কাছে দাঁড়িয়েছিল লোকেশ। চোখ নয় যদিও। সে চশমা মুছছিল।

যতদূর মনে পড়ে, ক্লাবের সেক্রেটারি প্রশান্ত হালদার আলাপ করিয়ে দেয় আমাদের। প্রথম দিনেই, সরলা থেকে পি জি-র ডাক্তারদের আন্ডারগ্রাউন্ড ক্যান্টিনে চা খেতে নিয়ে গিয়েছিল লোকেশ। কথা প্রসঙ্গে লোকেশ বলেছিল, 'সমস্ত ধরা-ছোঁয়ার বাইরে গ্রেটা গার্বোর এই যে অ্যাঞ্জেলিক অভিনয়, এ যে কী জিনিস, তা বুঝতে গেলে ওঁর দুটো ছবির একটা দেখাই যথেষ্ট।'

'দুটো ছবি কী কী?'

'একটা তো এই ক্যামিলি। যা দেখলেন।'

'আর একটা?'

'নিনোচকা।'

পরে জেনেছিলাম, 'ক্যামিলি' ছবির দিন আগাগোড়াই সে বসেছিল আমার পাশে। ইন্টারভ্যাল ছিল না। তাই লক্ষ্য করিনি। সিঁড়ির মাথায় আমাকে দেখালে প্রশান্ত বলেছিল, 'হ্যাঁ, চিনি। ও তো জয়ন্তী। জে এন ইউ-র ছাত্রী ছিল। কী যেন করে এসেছে ওখান থেকে।' মিস রুদালির সঙ্গে পরিচিত হওয়ার জন্যেই সেদিন গেটে দাঁড়িয়ে ছিল লোকেশ। তখন লোকেশের বয়স কত? গোটা পঁয়তিরিশ। আমার তেইশ।

—দশ—

বিনা মেঘে বজ্রপাত

১৯৮৯ সালের নভেম্বর মাস। ৪ তারিখ। রাতের শো-তে আমরা যমুনায় 'দা ফরবিডন ড্রিমস' দেখতে গেলাম। আমাদের ঢুকতে দেরি হয়েছিল। ড্রেস সার্কেলে দেওয়াল-ঘেঁষে একদম

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

পিছনের সিটে যে আপনারা জানব কী করে! সোমনাথ আমাকে হলের মধ্যে দু'বার চুমু খেল। কলকাতায় যমুনার মতন গো-অ্যাজ-ইউ-লাইক প্রেক্ষাগৃহ আর কোথায়, অবশ্য যদি বিড়লা প্ল্যানেটোরিয়ামকে হিসেবে না ধরি। তবে দ্বিতীয় চুম্বনের দীর্ঘ স্থায়িত্বের জন্যে, দুর্ভাগ্যক্রমে, আমিই ছিলাম পুরোপুরি দায়ী। আমার এই রোগা আর বয়ঃকনিষ্ঠ স্বামীটিকে আর এ-সব ব্যাপারে মানুষ করতে পারলাম না। এ-সব কি শিখিয়ে-পড়িয়ে দেওয়ার ব্যাপার— বলুন তো।

যা বোঝার ইন্টারভ্যালে বুঝলাম। নইলে দুর্বলতা প্রকাশ পাবে বলে, অকারণে ওর সঙ্গে লোকদেখানো ঢলানি করা হয়েছিল, আজ বুঝি, আমার পক্ষে চূড়ান্ত অপরিণামদর্শিতার ব্যাপার। ওর নিতান্ত মানডেন কথাগুলোরও আমি উত্তর দিচ্ছিলাম হেসে-হেসে। যে ছেলেটা কর্নফ্লেক বিক্রি করতে এসেছিল তার ঠোঁট কাটা। 'প' উচ্চারণ হয় না। দাম কত? বলল: এক টাকা আশি ফয়সা। এরপর সোমনাথ যদি দু-চারটি ফ্লেক মুখে ফেলেই বলে ওঠে, 'অফূর্ব। তা না?' — হাসির কথা সত্যিই। কিন্তু হেসে গায়ের ওপর ঢলে পড়ার মতো কথা কী? বিশেষত, দীর্ঘ আট মাস পরে এই প্রথম আমাকে সিঁদুর-গয়না-বালুচরি পরে দেখছে লোকেশ— এবং আমাদের ঠিক ঘাড়ের ওপর বসে আছে। আমরা দুর্ভেদ্যভাবে সুখী, গায়ে-পড়ে লোকেশকে এই বুঝ-দেওয়ার কি আদৌ কোনও দরকার ছিল? সে কি বিন্দুমাত্র প্ররোচনা দিয়েছিল? একটা কথা বলেছিল? একটা অভিব্যক্তি ফুটে উঠেছিল তার মুখে? আজ ভাবি, যমুনায় না গিয়ে যদি গ্লোবে যেতাম সেদিন তাহলে এই কপাল-পোড়া, ও-যদি আমার বিধিলিপিও হয়ে থাকে— অন্তত আরও কিছুদিন বিলম্বিত তো হতই।

হঠাৎ টের পেলাম লোকেশ দাঁড়িয়ে পড়েছে। স্পষ্ট শুনতে পেলাম আপনি বলছেন, 'কোথায় যাচ্ছ?' লোকেশ উত্তর দিল না।

এরপর সোমনাথ যা করল। ছবিটা ছিল হট। বিশেষত দ্বিতীয়ার্ধটা। কিসিং, মুচিং, হপিং সবই থাকবে এ-ধরনের নামের বিশেষত যমুনার ছবিতে, জানা কথা। একের পর এক বিছানা-দৃশ্য। তার ওপর নাইট শো। নিশ্ছিদ্র অন্ধকার। লোকেশের উপস্থিতির কথা ভেবে এবার কিন্তু আমি বাধা দিয়েছিলাম, এবং যথেষ্ট। কিন্তু ও তো শুনল না। এমন অসভ্যতা ও তো করেনি কখনও, আগে, কোনও সিনেমা হলে! বস্তুত, প্রথমার্ধে আমিই প্ররোচনা দিয়েছি। হ্যাঁ, আমিই তো। সর্বনাশ যখন নেমে আসবে, তার আগে বোধহয় এভাবেই উল্টো-পাল্টা হয়ে যেতে থাকে সব। অজানা দুর্লক্ষণ দেখা দিতে থাকে। এবং, যা ভাবাই যায় না, অন্তত সোমনাথের ক্ষেত্রে। আমি বাধা দিচ্ছি বলে সে কিনা বোতাম ছিঁড়ে আমার ব্লাউজ খুলল! দেখুন, আমাদের নতুন বিয়ে। বছর ঘোরেনি। এস এফ এ ছবি। এ যে খুব অস্বাভাবিক তা আমি বলছি না। আপনার মতন আর্ষ প্রয়োগ বাদে, এহেন যৌবন-দোষ যে-কোনও যুবতী স্ত্রীর কাছে প্রশ্রয় পাওয়ারও বিষয়। শুধু লোকেশ বসে আছে বলে। আর, একেবারে নাকের ডগায়। শুধু সেই জন্যে। এ হতে পারে না। এবং, কখনই।

আমাদের জন্যে না ছবির কারণে তা জানি না, দশ মিনিটের মধ্যে আপনারা উঠে গেলেন। ছবি শেষ হওয়ার আগে শরীর-খারাপের অজুহাতে আমিও উঠে এলাম সোমনাথকে নিয়ে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

এবার বেশ দেরি হচ্ছে দেখে বাবা হবে বলে খানিক প্রস্তুতও সোমনাথ। শুনে একটু হতাশই হয় সে, আমার মনে হল।

সুদীর্ঘ ৮ মাসে যা করেনি, পাঁচ দিন পরে, ৯ নভেম্বর লোকেশ তাই করল। সে আমাকে ফোন করল। খোদ শ্বশুরবাড়িতে!

সে ফোন নম্বর কোথা থেকে পেল এটা একটা রহস্য। অবশ্য পরে ভেবেছি, এ আর এমন কঠিন কী। সোমনাথের অফিসে ফোন করল। নেই? আচ্ছা, ওর বাড়ির নম্বরটা কত বলতে পারেন? এই তো। সমস্ত প্রাইভেট অফিসের অপারেটরই অফিসের প্রয়োজনীয় লোকজনদের বাড়ির নম্বর রাখে। বিশেষ, বিয়ের পরে-পরেই এম আর থেকে এ এম-য়ে বিরাট লিফট পেয়েছে সোমনাথ। তবে আমার শ্বশুরবাড়িতে সরাসরি ফোন করার সাহস পেল কী করে, আশ্চর্য হওয়ার ব্যাপার এটাই। তাহলে যা ভেবেছিলাম আমি! কথা রাখল না লোকেশ!

'ছোটবৌদি, ডাঃ গাউর ফোন করছেন তোমাকে'— দোতলা থেকে একেবারে নাম-টাম বলে ঘোষণা করছে ননদ কুর্চি।

সোমনাথ অফিসে। জা সুমিতা মুখ টিপে হেসে জানতে চাইলেন, 'কী ব্যাপার, জয়ন্তী গাইনি-টাইনি নাকি? এত তাড়াতাড়ি!'

'আট মাস হল তোমার বিয়ে হয়েছে। একদিনও কি ডিসটার্ব করেছি?'

'এটা আমার শ্বশুরবাড়ির ফোন?'

'তুমি একবার এসো।'

'না।'

'মিট মি ফর ওয়ান্স।'

'না।'

'ফর দা লাস্ট টাইম।'

'নোও।'

'আমি কিন্তু আর একবার ফোন করব না তোমাকে।'

আমি ফোন কেটে দিলাম।

সত্যিই করেনি। কিন্তু, নভেম্বরের শেষাশেষি সোমনাথের নামে একটি রেজিস্ট্রি পার্সেল এল। তার পর থেকেই সোমনাথ কেমন গুম হয়ে গেল। অবশ্য, আমি পার্সেলের সঙ্গে সম্বন্ধটা একদম বুঝিনি তখনও। নানান ওষুধ-কোম্পানি থেকে খাম তো হামেশাই আসে। তবে কিছু একটা গোপন করছে, সেটা বুঝতে পারছিলাম। খেতে দিলে খেতে বসে, মাঝপথে খিদে নেই বলে উঠে যায়। ওর অফিস যাওয়া অনিয়মিত হয়ে পড়ল। কিছু বললে, যেন একটু পরে বোঝে। দৃষ্টিতে নেমে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

এল এক অদ্ভুত শূন্যতা। অফিস থেকে ওর কলিগ শুভেন্দু ঘোষ এসে মেডিকেল লিভের দরখাস্ত লিখিয়ে নিয়ে গেল। কর্মযোগ থেকে লোকেশের দেওয়া মন্ত্রগুপ্তি প্রয়োগ করতে গিয়ে বারবার ব্যর্থ হতে লাগলাম।

হঠাৎ একদিন বলল, 'চল দীঘা যাই।'

ছবি দেখাল না। অত ভদ্র। কিন্তু প্রথম দিনেই ছবির কথা তুলল যা রেজিস্ট্রি ডাকে কেউ ওকে পাঠিয়েছে। সেন্ডার্স নেম অ্যান্ড অ্যাড্রেসের জায়গাটা ফাঁকা।

যা বোঝার, এক লহমায় বুঝলাম। রিল এবং ছবি নষ্ট করলেও একটা সেট লোকেশ রেখে দিয়েছিল। আমি আজও বিশ্বাস করি মিসেস গাউর, লোকেশ হয়ত কোনও অন্ধকার উদ্দেশ্য নিয়ে ছবিগুলো তার কাছে রাখেনি। সে তার কাছে রাখতে চেয়েছিল আমার টুকরো-টুকরো স্মৃতি। তা ছাড়া অন্য কিছু আমি ভাবব কী করে। নইলে তো, একটা কেন, চব্বিশটা ন্যুড ছবিই তো সে সেদিন অনায়াসে নিতে পারত। না, কিছু পাপড়িই কুড়িয়ে নিয়েছিল। রেখে দিয়েছিল এবং সেগুলোই দেয়নি। কেননা, আমার বিয়ের মন্ত্রোচ্চারণ অন্যে করলেও, সেই তো ছিল একাধারে সম্প্রদানকর্তা ও প্রধান পুরোহিত। যদিও নেপথ্যচারী। সে না সৃষ্টি করলে, আমি হই কী করে। কেউ দায়ী নয়। আমার মাঝে মাঝে মনে হয়, দায়ী আমিই। আমারই পর পর দু-দুটি ভুল। এক— যমুনায়। দুই— টেলিফোনে 'না' বলা। কী ক্ষতি হত আমার ওর ডাকে একবার সাড়া দিলে! হয়ত, এবার ও আমাকে ডেকেছিল দ্বিতীয় সেটটাও ফেরত দেবে বলেই। পূর্বাপর ভাবলে, কী করে ভাবা যেতে পারে যে, সে সম্ভাবনা একটুও ছিল না? রাখলে, ও তো আমাকে মিস্ট্রেস হিসেবে আজীবন রাখতে পারত। আমার সম্পূর্ণ ন্যুড কি ওর কাছে আমৃত্যু থাকতে পারত না? কিন্তু কী রেখেছিল সে কাছে? শুধু স্মৃতি। আমার চোখ, চুল, ঠোঁট, হাত ও পায়ের পাতা— আমার গ্রীবা, আমার স্তন (বলত, ওর হাতের তালুর মাপে তৈরি)— এই সব। বিশেষত দ্বিতীয় ভুলটির জন্যেই আমার এক জীবনের ভুলচুক হয়ে গেল, হায়!

তারপর? আর কী শুনবেন ম্যাডাম! ওর মুখে ছবির কথা শুনে ভয়ে আমার রঙ বদলে যাচ্ছে আমি টের পেলাম। প্রকৃত ভয়ে হয়ত নীলই হয়ে যায় মানুষ, নইলে কথাটা কি আর এতকাল ধরে চলছে। তবে আমি তো দেখিনি। সোমনাথ দেখে গেছে।

আমি আর দেরি করলাম না। আমি সব বললাম ওকে। আমি ওর হাঁটু জড়িয়ে ধরলাম। বিশ্বাস করবেন আপনি? সোমনাথ ক্ষমা করল আমাকে এবং সর্বান্তঃকরণে। আমার চিবুক তুলে ধরে বলল, 'আমি তো তোমাকে বিয়ে করেছি জয়ী। তোমার কৌমার্যকে নয়।'

বিশ্বাস করুন আপনি, ডু মি দিস ওয়ান অ্যাক্ট অফ ফেভার ম্যাডাম, প্লিজ! আপনি বিশ্বাস করুন। অনন্ত অনুভূতিলোক জুড়ে আমার মনে নেমে এল সেই গোধূলিলগ্ন— আর সেই স্বর্গ-আলোয় রক্তসূত্রগাছি দিয়ে বাঁধা আমাদের আর-একবার বিবাহ হতে লাগল। আমার সর্বাঙ্গ ভরে যেতে লাগল বিবাহের উল্কিতে। সারা গা টনটনিয়ে উঠল, বেদনায় না সুখে, তা বলব কী করে। মনে হল, ভগবান আছেন। আর নরনারায়ণ-রূপে তিনি এখন আমারই সম্মুখে। আমরা দুজনে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

দুজনকে জড়িয়ে ধরে অনেকক্ষণ নিস্পন্দ দাঁড়িয়ে রইলাম। আমি ওর পাথরের বুকে মুখ রেখে গুমরে গুমরে কাঁদতে লাগলাম। অনেকক্ষণ পরে আমার ঘাড়ে মাত্র একফোঁটা জল পড়ল। আজ বিকেলে বাইরে খুব মেঘ করেছে। আবহাওয়া জোলো। কিন্তু ঘরের মধ্যে তো কোনও আকাশ নেই। বুঝলাম, সোমনাথ কাঁদছে।

রাতের দিকে মেঘ কেটে গেল। অনেক রাত পর্যন্ত আমরা বিচে বসে রইলাম। ক্রমে আমার মাথা থেকে সমুদ্রের ধ্বনি মুছে গেল। রইল শুধু আকাশ। আর আকাশ-ভরা তারা। হঠাৎ দেখলাম আমি গুনগুনিয়ে গাইছি:

'আমার সকল দুখের প্রদীপ জ্বেলে দিবস গেলে করব নিবেদন...'

এবং আরও পরে আমি যখন গাইছিলাম:

'যখন পূজার হোমানলে উঠবে জ্বলে একে একে তারা

আকাশ-পানে ছুটবে বাঁধন-হারা...'

আমি জানি, আমার চেয়ে ভাল করে ওই গান, আমার পরে এ-পৃথিবীতে, এই দীনা পৃথিবীর কোথাও বসে কেউ কোনওদিন গাইতে পারবে না। তখন আমি মর্মে মর্মে বুঝতে পারছিলাম, মানুষের শরীরের মধ্যে কিছু থাকে না, মানুষ একটা শরীর বা শরীরই মানুষ— এ কথা ঠিক নয়। ভুল, একদম ভুল। মানুষের শরীরের মধ্যে অন্তত একজন থাকে। অন্তত চিরকাল সে ছিল। পৃথিবীর তিনভাগ জলরাশির সামনে বসে যে একা গান গায়।

তারপর... সেদিন ভোররাতে হোটেল ব্লু লেগুনের বাথরুমে ঢুকে সে যা করল, আপনাকে আগেই জানিয়েছি। সব কাগজে খবর হয়েছিল। হোটেলের কিচেনে গিয়ে নিজের হাতে জল ফুটিয়ে এনেছিল, জানেন ম্যাডাম!

— এগারো—

রাখে হরি মারে কে

এরপর আপনাকে দাদার সঙ্গে আমার সারা ভারত ভ্রমণের এক সুদীর্ঘ কাহিনী বলতে হয়, যদিও এর কাহিনী অংশ খুবই ছোট্ট আর হয়ত দুটি মাত্র শব্দ ব্যবহারেই তা সম্পূর্ণ হয়ে যায় এবং তা হল: কোথায় লোকেশ!

আপনার ধারণা, খোঁজখবর পুলিসই যেটুকু যা করার করে। তারপর উমেশ সামন্ত। কিন্তু তা ঠিক নয়। পুলিসের কাজ কাগজ-রেডিও-টিভিতে বিজ্ঞাপন আর ভারতবর্ষের থানায় থানায় ছবি পাঠানোর মধ্যেই শেষ হয়ে যায়। আর উমেশবাবু! ক্লু না-পেয়ে, ক্লু না-পেয়ে ওঁর তো শেষ পর্যন্ত মাথাটাই গেল গুবলেট হয়ে। কী রকম হাঁদা গঙ্গারাম লোক দেখুন। শেষমেশ একটা ক্লু উনি

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

পেয়েছিলেন এবং অব্যর্থ। যে, আমি মাদ্রাজে। একদম পাক্কা খবর। 'হিন্দু' ওখানে সবাই পড়ে। বেশ বড় বড় করে বিজ্ঞাপন দিলেন: স্পেশাল এডুকেশনে যার হ্যান্ডিক্যাপস-এ জে এন ইউ-এর ডিপ্লোমা আছে— এমন মহিলা দরখাস্ত করুন। মাইনে ৫০০০+। বাঙালি হলে ভাল হয়। টেলিফোন নম্বর। উনি জানেন, আমার ওই ডিগ্রি আছে এবং জে এন ইউ থেকেই। অতএব, যদি চোখে পড়ে ওঁর ফাঁদে পা দেব। তবু যদি শেষ লাইনটা না থাকত! ম্যাডাম, খুঁজে খুঁজে পৃথিবীর এই সবচেয়ে বুদ্ধিমান গাধাটিকে আপনি জোটালেন কোত্থেকে, বলুন দেখি!

লোকেশকে খুঁজে বের করার জন্যে কেউ যদি সত্যিকারের চেষ্টা করে থাকে, তবে জেনে রাখুন, সেই লোক হলাম আমি আর দাদা সুব্রত বসুরায়, সার্জেন্ট, ক্যালকাটা ট্র্যাফিক। একবার, শুনলাম, সে হৃষীকেশে, স্বামী শিবানন্দর আশ্রমে। কাতরাসগড়ে খনি এলাকা, বড়জামদা আর নোয়ামুন্ডি— এইসব কাছাকাছি জায়গা থেকেও খবর এসেছিল। একবার খবর এল, সে বম্বের ধারাবি বস্তিতে। তার নাকি এইডস হয়েছে। ওখানে তার বর্তমান নাম: রামখেল তিলক সিং। অনেক জায়গায় আমরা গেছিও। সূত্রাদি আর জায়গার নাম বলে বলে সময় নষ্ট করব না। লিখতে লিখতে রাত ১০টা হয়ে গেল। শুধু এইটুকু যে আমি হীরের নাকছাবি-সহ আমার সমস্ত গয়না বিক্রি করে দিয়েছিলাম। বাবা-মা-র সমস্ত ফিক্সড ও যাবতীয় ইনভেস্টমেন্ট মায় শেয়ার আমার ক্যাশ করে নিয়েছিলাম। প্রায় ৫ লক্ষ টাকা নিয়ে এই কাজে আমরা নামি। সারা উত্তর, দক্ষিণ, পূর্ব এবং পশ্চিম ভারতবর্ষের চার প্রান্তে আমাদের জন্যে ৪ জন এজেন্ট কাজ করছিল। তৎসহ তাদের লোকজন। লানডন-এ আমাদের লোক ছিল চেলসির এক নামকরা রেস্তোরাঁর মালিক— হরদেও সিং।

প্রায় তিন বছর ধরে হারিয়ে যাওয়া ডাঃ লোকেশ গাউরের শেষ নির্ভুল খবর এল আমাদের দক্ষিণ ভারতের প্রতিনিধির কাছ থেকে। আমরা তখন কলকাতার কাছেই— বজবজে রয়েছি। সেদিনই করমণ্ডল ধরলাম। যাবার আগে ৬টি বুলেট বের করে, আবার পুরে, সেফটি খুলে ও বন্ধ করে রিভলভারটা স্যুটকেশে জামা-কাপড়ের নিচে রেখে দিতে দিতে দাদা বলল, 'মারিনা বিচের কাছে ওয়ালাঝা রোড। ওখানে ওয়েস্টবেঙ্গল গাভমেন্টের ইয়ুথ হস্টেল। ডাক্তার সেখানে।'

বিকেল বেলার করমণ্ডল ধরে, লেট করার দরুন পরদিন রাত ৯টা নাগাদ ইয়ুথ হস্টেলে পৌঁছে ওয়ার্ডেনকে দাদা লোকেশের ছবি আর আইডেনটিটি কার্ড দেখাল। ছবি দেখে ওয়ার্ডেন পরমেশ্বরন বললেন, 'ইয়াস। মিঃ সাৎতেন সানিয়াল। বাট হি হ্যাজ চেকড্ আউট দিস ভেরি মর্নিং। ফর তিরুপতি।' এর পর শুরু হল 'সত্যেন সান্যালকে খুঁজে বের করার জন্যে সেই কন্যাকুমারিকা পর্যন্ত তোলপাড়-করা আমাদের তিনমাসব্যাপী দীর্ঘ অনুসরণ-কাহিনী। ইয়ুথ হস্টেলের ছাদে মাদ্রাজ শহরে একমাত্র মাছ-ভাত খাওয়ার জায়গা। বৈদ্যবাটি থেকে শঙ্কর নেত্রালয়ে গ্লকোমা দেখাতে এসেছেন শিশিরশুভ্র শিরোমণি। আমাদের টেবিলেই খেতে বসেছিলেন। বললেন, 'হ্যাঁ-হ্যাঁ। সত্যেনবাবু। দোতলার চার নম্বর ঘরে প্রায় এক মাস ছিলেন। ট্রিটমেন্ট করাচ্ছিলেন অ্যাপোলোয়।' আমাদের এজেন্ট এস ভি কীর্তির কাছে জানা গেল সত্যেনবাবু তিরুপতি যাবার ব্যাপারে তার কাছে খোঁজখবর নিয়েছিলেন।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

দাদা বলল, 'ডাক্তার যখন বলেছে তিরুপতি, আর যেখানেই যাক, তিরুপতি যাবে না। কারণ, ও জানে আমরা ওকে সারা ভারতবর্ষ জুড়ে খুঁজছি। আর, কীর্তি বলছিল, ওকে বোধহয় একটু সন্দেহের চোখেই দেখেছে ডাক্তার। তাই হঠাৎ পালিয়েছে।'

দাদার কথাই ঠিক। পরদিন ভোরে টি টি ডি সি-র আন্নামালাই রোডের অফিসে গিয়ে দেখা গেল বাসের পর বাস দাঁড়িয়ে। চিফ ট্যুর ডিরেক্টর ছবি আর রেজিস্টার দেখে বললেন, সাতদিনের প্যাকেজ ট্যুরে কমবেশি এ-রকমই দেখতে এক ভদ্রলোক কাল সকালে দক্ষিণ ভারত বেরিয়ে গেছেন। তবে তাঁর নাম বিমলেন্দু বসাক। ছবির সঙ্গে তাঁর বেশ মিল আছে। আর তিরুপতির বাস এই তো এইমাত্র বেরিয়ে গেল। এখনও গোল্ডেন বিচ পেরোয়নি। বাঙালি অনেকেই গেছেন। তিরুপতির রেজিস্টারে আমরা দেখলাম, উমেশ সামন্তর নাম রয়েছে। দেখে হাসলাম।

মিনিট পনের পরে সাতদিনের ওই একই প্যাকেজ ট্যুরে দক্ষিণ ভারতের জন্য বাস ছাড়ছে শুনে দাদা টিকিট আছে কিনা জানতে চাইল। ভাগ্যিস, চারজনের একটা পার্টি শেষ মুহূর্তে টিকিট ক্যানসেল করল। আমরা দুটি সিট পেয়ে গেলাম।

প্রথম হল্ট শ্রীরঙ্গমের মন্দিরে। টানা ৮ ঘণ্টার জার্নি। বাস যখন মারিনা বিচ ধরে যাচ্ছে, এই প্রথম দাদা আমার সঙ্গে কথা বলল, 'পুলিসকে দোষ দিস কেন। কেন হাসিস উমেশ গোয়েন্দার বোকামির কথা ভেবে। যে লোক ঘণ্টায় ঘণ্টায় নাম বদলায় আর একদিনের জন্যে তিরুপতি যাচ্ছে বলে, যায় সাতদিনের দক্ষিণ ভারত ট্যুরে...'

দাদা চুপ করে গেল। ঠিক এর পরেই 'হিন্দু' কাগজে দেওয়া উমেশবাবুর বিজ্ঞাপনটি দাদার চোখে পড়ে। 'দ্যাখ, অ্যাপ্লাই করবি নাকি?' বলে হেসে কাগজটা এগিয়ে দেয় আমার দিকে। 'স্টুপিড!' দাদা মন্তব্য করল, 'গোবরবাবু!'

তামিলনাড়ু ট্যুরিজম-এ এই প্যাকেজ ভ্রমণগুলো সম্পর্কে একটা কথা বলা দরকার। এই ট্যুরগুলোয় সারাদিন ধরে একদম এক নম্বরের লাক্সারি বাস ছোটে। দুপুরের মধ্যে একটা না-একটা বিখ্যাত মন্দিরে নিয়ে যায়। তারপর সে-রাত্রির মতো টি টি ডি সি-র বিলাসবহুল হোটেলে রাখে। অন্যত্র থাকার উপায় নেই। পরদিন ভোরে আবার ওখান থেকেই বেরিয়ে পড়বে। কাজেই এ-যাত্রায় যে লোকেশকে আমরা পাচ্ছি, তাতে কোনও ভুল নেই। এবং তিরুচিরাপল্লী, সুচিন্দ্রম, তিরুচেন্দুর, তাঞ্জাভুর, রামেশ্বরম— সন্ধ্যাবেলায় আমরা যেখানেই পৌঁছই, দেখি রেজিস্টারে 'বিমলেন্দু বসাক'-এর নাম এবং স্বাক্ষর রয়েছেও। কিন্তু, সর্বত্র থেকে 'সেদিন সকালে' তার বাস বেরিয়ে গেছে। এ যেন ফিজিক্সের সেই মাসহীন অ্যান্টি-পার্টিকেলের হালচাল— ছিল, কিন্তু এখন নেই। যার অস্তিত্বের খবর সব সময় জানা যায় যে 'ছিল' বলে। তাকে কখনও বর্তমান অবস্থায় ধরা যায় না।

বিকেলে কন্যাকুমারীর আগে দুপুরবেলা চিদাম্বরম। বিখ্যাত নটরাজ মূর্তির সামনে দাঁড়িয়ে দাদা আমাকে বলল, 'কন্যাকুমারীতে পৌঁছে আমরা বাস ছেড়ে দেব। একটা ট্যাক্সি নেব আর

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

রাতারাতি পৌঁছে যাব কোদাই কানালে। টি টি ডি সি-র হোটেলেই তো থাকবে। ভোরের বাসে ওঠার আগেই কুত্তার বাচ্চাকে পেয়ে যাব।' কিন্তু, ঠিক সে-রকমটা হল কই।

ট্যুর-বাস কন্যাকুমারী থেকে যায় ত্রিবান্দ্রমে। একটু কেরল। সেখানে একরাত থাকে পরদিন সন্ধ্যায় কন্যাকুমারী ফিরে আসে। তার পরের দিন ভোরে যায় কোদাই কানাল। যারা ত্রিবান্দ্রম যাবে না, তারা ইচ্ছে করলে কন্যাকুমারীতেই দু'রাত্রি থাকতে পারে। আমরা যেদিন পৌঁছলাম, সেই দিনটাই ছিল কোজাগরী পূর্ণিমার রাত। বছরে ওই একদিন চন্দ্রোদয় ও সূর্যাস্ত একই সঙ্গে দেখা যায় বঙ্গোপসাগর, আরব সাগর আর ভারত মহাসাগরের মিলন-মোহানায়। এ-দৃশ্য নাকি পৃথিবীর নয়, স্বর্গের। আমরা জানতে পারলাম, আর ক'জন ট্যুরিস্টের মতো লোকেশ ত্রিবান্দ্রম যায়নি। আমরা অনুমান করে নিলাম আজকের এহেন বাৎসরিক স্বর্গ-শোভা দেখবে বলেই। তবে, সকাল থেকেই সে হোটেলে নেই। এবং লাঞ্চেও আসেনি।

অপরাধতত্ত্ববিদ্‌রা দেখেছেন, মৃত্যু অবধারিত জানতে পারলে হন্যমান নাকি, জ্ঞাত বা অজ্ঞাতসারে হননকারীকে কিছুটা সাহায্য করে থাকে। বিড়ালের মুখের মধ্যে একবার চলে গেলে ইঁদুর নাকি 'হুররে' বলে খিল কেটে কেটে তার পেটের মধ্যে চলে যায়? ব্যাপারটা কি সেইরকম নাকি? অন্তত, আমার তো তাই মনে হল। নইলে ক্ষুরের ধারের ওপর দিয়ে যে হেঁটে চলছে আজ তিন-তিনটি বছর, সে যেখানে যায়, সেখানেই আমাদের ছায়া— ছুটতে ছুটতে স্বর্গ-আলোর হাতছানিতে সে হঠাৎ এভাবে দাঁড়িয়ে পড়বে কেন। নাকি, ভেবেছে খুঁজতে-খুঁজতে-খুঁজতে-খুঁজতে আমাদের খোঁজার কারণটাই গেছে হারিয়ে! আমরা হাল ছেড়ে দিয়েছি! হায় লোকেশ, ভবিতব্য একেই বলে।

ঠিক হল, সন্ধ্যার সাগরবেলায় তাকে খুঁজে বের করা হবে। না পেলে হোটেলের ২৩৪ নম্বর রুম তো আছেই। যেটা তাকে দেওয়া হয়েছে। যেখান থেকে সে বেরিয়ে গেছে ব্রেকফাস্ট খেয়েই।

'কুকুরের মতো যাকে আঁস্তাকুড়ে মারার কথা' শেষবারের মতো গুলিগুলো দেখে নিয়ে, চেম্বারে ঠেলে দিতে দিতে দাদা বলল, 'সেই কুত্তা, সেই কামিনে কিনা মরবে তিন সমুদ্রের মোহানায়। যখন', বলতে বলতে দাদা গুলিয়ে ফেলল, 'যখন সূর্যোদয় আর সূর্যাস্ত একসঙ্গে।'

'হোয়াট এ গ্র্যান্ড ফিনালে ফর এ পারিয়া ডগ!'— দীর্ঘশ্বাস ফেলে আমিও ভাবি। দাদার বুকের উত্তাল ওঠা-নামা দেখে মনে হয়, একটি বিশাল সাম্রাজ্যের উত্থান আর পতন ঘটে চলেছে সেখানে।

কন্যাকুমারী ছোট জায়গা। আর, দেখা হয়ে গেল বিকেলবেলাতেই। যখন সমুদ্রের বুকে বড় বড় ঢেউ তুলে আমরা বিবেকানন্দ রকে যাচ্ছি আর লোকেশ ফিরছে। দোতলার খোলা ডেকে ড্রাইভারের কেবিনের পাশে সে একা দাঁড়িয়েছিল। একদম পাশাপাশি দুটি স্টিমার। আমাদের স্টিমারের ঢেউ ওর স্টিমারের ঢেউকে ধাক্কা মেরে লাফ দিয়ে উঠল প্রবল সঙ্ঘর্ষে।

আমরা দেখলাম লোকেশ আমাদের দেখছে। এবং পালিয়ে যাচ্ছে না। সমুদ্রজল থেকে প্রতিবিম্বিত হয়ে অপরাহ্নের রক্তাভ রোদ নড়াচড়া করছে ওর মুখে-চোখে। তাকে স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে। এমনকি ডান হাত তুলে সে একবার উইশও করল আমাদের। হাসল মনে হল।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

অটোমেটিক আমেরিকান মেশিন এবং রেঞ্জের একেবারে বাইরেও ছিল না সে। বুম-বুম। বুম-বুম-বুম। বুম!

দাদার হাতে রিভলভারের চেম্বার খালি হয়ে গেল। কিন্তু, লোকেশ অনেক আগেই জলে ঝাঁপ দিয়েছে। কপাল আর কাকে বলে। সেখানে আয়ু থাকলে খণ্ডাবে কে।

না, আমি তো নয়ই। আমার দাদাও সাঁতার জানে না।

— বারো —

এসো, নীপবনে

সাউথ ইন্ডিয়া থেকে ফেরার পর প্রায় দু'মাস হতে চলল। কোথা থেকে লোকেশের আর কোনও খবর নেই। আমরা এক এক করে এজেন্টদের ছুটি দিতে বাধ্য হলাম। তিন বছরে আমাদের রেস্ত প্রায় সবটাই ফুরিয়ে এসেছিল।

তা বলে হাল ছেড়ে দিয়েছিলাম, ভাববেন না যেন মিসেস গাউর। লোকেশ, আপনি জানেন, আপনাদের পারিবারিক শ্রীশ্রী জনার্দন জিউ-এর সামনে কুশাসন পেতে নিত্য গীতা-পাঠ করত। বিশেষত গীতার একাদশ অধ্যায় ছিল তার কণ্ঠস্থ। গীতার আর-একটি বিখ্যাত শ্লোকের কথা সে আমাকে বারবার বলত:

ময়ৈবতৈ নিহতাঃ পূর্ব্বমেব।

নিমিত্তমাত্রং ভব সব্যসাচিন।।

যা নাকি পরাঙ্মুখ অর্জুনকে শ্রীকৃষ্ণ বলেছিলেন। কুরুক্ষেত্রে। যে কাকে, কাদের মারতে দ্বিধাগ্রস্ত তুমি? ক্লৈব্যং মাস্ম গমঃ পার্থ! আমি তো ওদের আগেই মেরে রেখেছি। তুমি এদের মৃত্যুর নিমিত্তমাত্র হও। তারপর নাকি দেখান বিশ্বরূপ। এ-সব লোকেশ বলেছিল আমাকে।

সে যে খুন হবে এবং আমারই হাতে এতে আমার কোনও সন্দেহ ছিল না, কখনও। দাদার হাতে তার মরবার কথা নয়, তাই মরেনি সেদিন। কিন্তু সমস্ত যুক্তিতর্ক সম্ভব-অসম্ভবের বাইরে এটা ছিল আমার কাছে একটা উপসংহার যে তাকে মরতে হবে এবং আমার হাতে। এদিক থেকে এ-কাহিনীর শুরুই শেষ থেকে, যদি এভাবে ভাবতে পারেন তো ভাল হয়। অর্থাৎ, গীতার দিক থেকে।

সচেতন-অচেতন, আমার মন বা নির্মন কোথা থেকে এ ব্যাপারে কোনও প্রশ্ন তাই কোনওদিন ওঠেনি। আসলে তার অবধারিত ভবিতব্যই আমাকে ক্রমাগত টেনে নিয়ে যাচ্ছিল লোকেশের দিকে। অনেক সময় চলন্ত মেশিনের চাকায় আটকে যায় না জামাকাপড়? যার পর থেকে মেশিনের গতিবিধির নিয়মে চলে যেতে হয় তার গর্ভে— ওকে তাড়া করার ব্যাপারটা শুরু থেকেই ছিল

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সেই রকম। অতএব, তার খবর আসুক বা না আসুক সে নিয়ে কোনও দিনও আমার বিন্দুমাত্র মাথাব্যথা ছিল না। ইতিমধ্যে ছোট্টু সিং দেশে গিয়ে আর এল না। আর দাদাও ড্রাইভার হয়ে সুড়ুৎ করে ঢুকে গেল আপনার অন্দরমহলে। আপনি জানতেও পারলেন না।

তারপর মাত্র গত পরশুদিন বিনা মেঘের আকাশ থেকে অঝোর ধারার মতো এই চিঠিটা সাধারণ ডাকে আমি পাই, যার অপরিবর্তিত কপি নিচে দিলাম। আমি স্বীকার করতে বাধ্য যে এর চেয়ে অপ্রত্যাশিত ঘটনা আমার জীবনে আর দ্বিতীয়টি নেই।

গোঁসাইগোবিন্দপুর

১৫ জুন, '৯৩

কল্যাণীয়া জয়ন্তী

ছোটবেলায় বিভূতিভূষণের 'চাঁদের পাহাড়' নামে একটি বই পড়েছিলাম। দূর আফ্রিকায় রেলশ্রমিক হিসেবে কাজ করতে গিয়েছিল গ্রামের ছেলে শঙ্কর। প্রান্তরের মধ্যে তাঁবুতে একদিন রাত্রে দেখা দিল এক মাম্বা। চার ফুট উঁচু শুধু তার ফণাটাই। জ্বলন্ত টর্চ ধরে শঙ্কর তাকে নিস্পন্দ করে রাখে বহুক্ষণ। সে জানে, একটু নড়েছে কি ছোবল, নিশ্চিত মরণ। কিন্তু, ছ'সেলের টর্চ ধরে কতক্ষণ! হাত পাল্টাবারও উপায় নেই। এক সময় সীসের মতো ভারি হয়ে এল তার হাত। সে বুঝল শুধু হাত কেন, এই টর্চের ভার বহন করার ক্ষমতা তার সমগ্র অস্তিত্বেরই আর নেই। একে নামিয়ে রাখা স্বস্তি এখন সাপের ছোবলের চেয়ে বেশি কাম্য।

আশা করি, এই গল্পের পর আর তোমাকে বলতে হবে না যে আমি অবশেষে আমার মৃত্যু কামনাই করছি এবং তোমারই হাতে এবং কেন। আজ তিন বছর ধরে মৃত্যুর আগে আগে ছুটে ছুটে আমি অবশেষে ক্লান্ত। হৃষীকেশ, কাতরাসগড়, নোয়ামুণ্ডি... আমি যেখানেই পালিয়েছি, দেখেছি তোমার ছায়া। এমনকি বোম্বের কুখ্যাত বস্তি ধারাবিতে— তোমার গুপ্তচরদের হাত থেকে পরিত্রাণের আশায় যেখানে রটিয়ে দিয়েছিলাম আমার এইডস হয়েছে— এমনকি সেখানে কিছুদিনের মধ্যে স্বয়ং তোমার ছায়া। কিন্তু তখনও পালিয়ে যেতে পারতাম তোমাদের জাল কেটে— তোমাদের ধরাছোঁয়ার বাইরে। বারবার পেরেওছি। কন্যাকুমারীতেও ব্যাতিক্রম হয়নি।

কিন্তু ওখানে এতদিন পরে স্টিমারের ডেক থেকে তোমাকে আবার দেখতে পাওয়ার পর থেকে— গত দু'মাসে আমার পালিয়ে-বেড়াবার উদ্দেশ্যটাই অবশেষে হারিয়ে গেছে। কন্যাকুমারীর সাগরজলে ধুয়ে মুছে গেছে। তারপর থেকে আমি আর চোখের পাতা ফেলতে পারি না। ফেললে খুলতে পারি না। এখন তোমার ছায়া নির্গত হয় আমার শরীর থেকে। আমার পায়ের কাছে পড়ে থাকে, যখন রোদ ওঠে। দেখি, তোমার হাতে ছায়া-রিভলভার। আমি চলৎশক্তিহীন হয়ে পড়ি। এক কথায় আর কোথাও পালাবার শক্তি আমার নেই।

হ্যাঁ, আমি খুনি। সোমনাথের মৃত্যুর জন্য আমিই দায়ী। আমার শাস্তি মৃত্যু। এবং, তোমার হাতে। ২৫ জুন থেকে আমি তোমার জন্যে এখানে দিবারাত্র অপেক্ষা করব। শুধু দুটি ব্যাপার

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

তোমাকে পুনর্বিবেচনা করে দেখতে অনুরোধ করি। এক, সুব্রতকে সঙ্গে আনার কোনও দরকার নেই। দুই, রিভলভার আনবে। কিন্তু, আমার মতে নিরাপদ দূরত্ব থেকে ছোঁড়া রিভলভারের গুলি দিয়ে হত্যার মধ্যে তোমার জিঘাংসা তৃপ্ত হওয়ার নয়। আমি তাই নিজেই একটি ধারাল ক্ষুর আনিয়ে রেখেছি। আমি অ্যানাটমিতে আমাদের ব্যাচে ফার্স্ট হয়েছিলাম। কীভাবে গলার ঠিক কোনখানটাতে বসালে মাখনের মতো ঢুকে যাবে, আমি সব শিখিয়ে দেব তোমাকে। শিক্ষান্তে, আমরা জঙ্গলটার মধ্যে যাব।

সবশেষে, প্রেমিকা হলেও তুমি কন্যাসমা। সেভাবেই মিশেছ। তোমার নিষ্কাম ক্ষমাহীনতার উদ্দেশ্যে আমি সশ্রদ্ধ প্রণাম জানাই। ইতি,

তোমারই

লোকেশ

পথনির্দেশ

এসপ্ল্যানেড থেকে বারিপদার বাস। লোধাশুলি পেরিয়ে সুবর্ণরেখার ওপর নতুন ব্রিজ। ওপারে গোপীবল্লভপুর। সেখান থেকে অটোরিকশা। শেষের দিকে তিন কিলোমিটার জঙ্গল পেরিয়ে আবার সুবর্ণরেখা। জগবন্ধু মন্দিরের চূড়া এখান থেকে দেখা যাবে। মোট ২০ কিলোমিটার গোপীবল্লভপুর থেকে। সঙ্গে একটি ম্যাপ এঁকে দিলাম। শঙ্কর মহারাজ নাম খোঁজ করবে।

— লোকেশ।

আজ ২২ জুন। ঝাড়গ্রামের ফরেস্ট রেস্ট হাউসের দোতলায় আমি এখন। একতলায় ঢঙ ঢঙ করে রাত বারোটা বাজল।

বেজায় গরম এখানে, ম্যাডাম। সন্ধ্যাবেলায় ছিল লোডশেডিং। তবে আষাঢ়ের প্রথম দিনে অঢেল মেঘ জমেছে আকাশে। গর্জন নেই মোটেই। তাই মনে হচ্ছে, ভালই বর্ষাবে।

ফ্রিজ থেকে একটা আইসক্রিম বের করে খেতে খেতে চিঠির এই শেষাংশটুকু লিখছি আপনাকে। নিজের হিরো-হন্ডায় কলকাতা থেকে দাদা আসছে। যে-কোনও মুহূর্তে এসে পড়বে। আমরা আজ রাতেই গোঁসাইগোবিন্দপুর যাব। না-না, আমরা দু'জনেই যাব। কোটি-কোটি মুহূর্ত ধরে লালন করা জিঘাংসা আজ আমাদের পরিণত করেছে অর্ধ-শ্বাপদে। আজ আর একা হওয়ার উপায় নেই। যদিও মারব আমিই আর এটাই ঠিক হয়েছে, কিন্তু লোকেশের রক্তদর্শন থেকে দাদাকে বঞ্চিত করার অধিকার আমার আর নেই।

ইতিবসরে ম্যাডাম, আইসক্রিম খেতে খেতে, আসুন আপনাকে একটা দৃশ্য দেখাই। কুরুক্ষেত্রের মাঠে যেভাবে কৃষ্ণ দেখিয়েছিলেন অর্জুনকে।... ম্যাডাম, ঝাড়গ্রাম-ময়ূরভঞ্জ সীমান্তে সুবর্ণরেখা নদীতীরে ওই দেখুন প্রাচীন জগবন্ধু মন্দির। ওই দেখুন আরও দূরে প্রাচীন চন্দ্ররেখা দুর্গের ধ্বংসাবশেষ।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ভোরের প্রথম আলোয় দেখুন নয় স্কোয়ার কিলোমিটার ব্যাপী জঙ্গলটি কীভাবে ধীরে ধীরে ফুটে উঠছে। আর মাত্র কয়েক ঘণ্টা পরে ২৩ জুন ভোরবেলা। জগবন্ধু মন্দিরের পুরোহিত শঙ্কর মহারাজের লাশ ওই দেখুন, মৃত্যুর ক'ঘণ্টা আগেই পড়ে আছে। একদম গীতা, তাই না? তাঁর পরনে রক্তাম্বর। গলায় রুদ্রাক্ষ। তাঁর গলা আধাআধি গভীরভাবে কাটা। রাতে মুষলধারে বৃষ্টি হয়েছিল। তাই কোথাও রক্ত নেই।

চিঠি পড়া শেষ। ম্যাডাম, এবার পুলিসে খবর দিন। না, ভয় নেই, আমরা কোথাও পালাব না। আমরা এখানেই থাকব। হ্যাঁ, দু'জনে।

ওই যে, দাদার হিরো-হন্ডা কম্পাউন্ডে ঢুকছে।*❑

* ড্রয়িং থেকে যেমন পেয়ন্টিং, আমার একটি পূর্বপ্রকাশিত ছোটগল্প এই উপন্যাসে ব্যবহার করেছি। — লেখক।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~